এইচআইভি ভাইরাসের বিরুদ্ধে নতুন আশার আলো পৃ. ০৮

পাসওয়ার্ডে চালু হবে ‘মাইন্ড-রিডিং’ ব্রেইন ইমপ্লান্ট! পৃ. ২৩

শতবর্ষের এক ব্ল্যাক হোল অভিযানের নকশা পৃ. ১২

বিজ্ঞানবার্তা

সংখ্যা ১, ইস্যু ৬

আগস্ট ২০২৫

বৃহত্তম ব্ল্যাক হোল

যার ভর ৩৬০০ কোটি সূর্যের সমান!

পৃ. ১৪

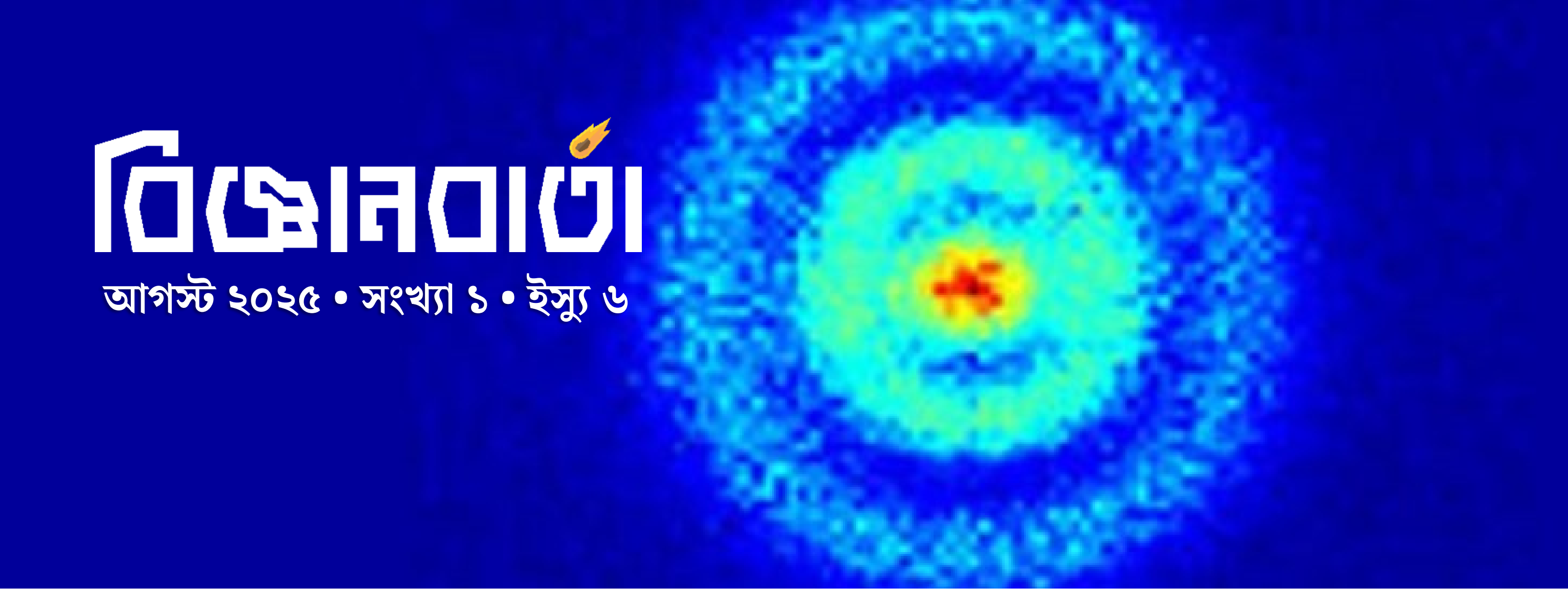

বিজ্ঞানবার্তা

আগস্ট ২০২৫ • সংখ্যা ১ • ইস্যু ৬

সম্পাদক
তানভীর রানা রাব্বি

সহ-সম্পাদক
সাদিয়া ইসলাম

প্রচ্ছদ
ESA/Hubble/NASA

প্রকাশক
বিজ্ঞানবার্তা (bigganbarta.org)
তারিখ: ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫
ইমেইল: editor@bigganbarta.org

@bigganbarta
@bigganbarta
@bigganbarta
@bigganbartafb
info@bigganbarta.org
bigganbarta.org

সম্পাদকীয়

বিজ্ঞানের প্রতিটি নতুন আবিষ্কার আমাদের সামনে এক অদ্ভুত জানালা খুলে দেয়। কখনও তা মহাকাশের অজানা গ্রহে প্রাণের সম্ভাবনা, কখনও ক্ষুদ্র কণার রহস্য, আবার কখনও আমাদেরই দেহের ভেতরের জটিল জীববিজ্ঞান। বিজ্ঞান শুধু উত্তর দেয় না, বরং নতুন প্রশ্নও ছুঁড়ে দেয়, যেগুলো আমাদের ভাবায়, অনুপ্রাণিত করে এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনা নিয়ে স্বপ্ন দেখতে শেখায়।

আজ আমরা এমন এক সময়ে দাঁড়িয়ে আছি, যখন প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও মহাবিশ্ব-গবেষণা সমানতালে এগোচ্ছে। নিউট্রিনোর ক্ষুদ্র সংকেত যেমন মহাবিশ্বের রহস্য উন্মোচনে সহায়ক, তেমনি স্থানীয় ঝর্ণায় নতুন প্রজাতির সন্ধান আমাদের জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব মনে করিয়ে দেয়। আবার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নতুন দিগন্ত গবেষণাকে করছে আরও গতিশীল।

তবে অগ্রগতির পাশাপাশি আমাদের দায়িত্বও বাড়ছে। বৈজ্ঞানিক তথ্য যেন কেবল গবেষণাগারে সীমাবদ্ধ না থেকে সমাজের কল্যাণে কাজে লাগে, সেটিই হওয়া উচিত আমাদের প্রধান লক্ষ্য। বিজ্ঞানের আলো সকলের জন্য, এই বিশ্বাস নিয়েই বিজ্ঞানবার্তার পথচলা।

— সম্পাদক

২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৫

সূচীপত্র

কভার

১৪ সম্ভাব্য বৃহত্তম ব্ল্যাক হোলের সন্ধান

বিজ্ঞান কথা

২২ জিনোম

ছবি

৩৩ আগস্ট মাসের সেরা বিজ্ঞানচিত্র

২৯ সাড়ে সাত কোটি বছর পুরোনো ফড়িং প্রজাত

৪২ মানুষের শরীরে শূকরের ফুসফুস প্রতিস্থাপন

৪২ মানুষের দুই পায়ে হাঁটার রহস্য উদঘাটন

৪৫ পারমাফ্রস্টে জীবিত থাকার জীবাণুর রহস্য

অন্যান্য

২৮ বাংলাদেশের মুরগির খামারে অ্যান্টিবায়োটিকের অতি ব্যবহারের ভয়াবহ দৃশ্য

সংবাদ

০৪ K2-18B তে প্রাণের চিহ্ন প্রায় অদৃশ্য

০৫ ক্ষুদ্রাকৃতির যন্ত্র দিয়ে নিউট্রিনো ধরা সম্ভব!

০৭ বাংলাদেশে ‘প্যানথার ড্যানিও’ মাছ

০৮ এইচআইভি ভাইরাসের বিরুদ্ধে নতুন আশার আলো

১০ নতুন ওপেন-ওয়েট লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল

১২ ব্ল্যাক হোল অভিযানের নকশা!

১৫ মানুষের ভিটামিন সি তৈরির ক্ষমতা হারানো

১৯ নতুন কার্বন অণু তৈরি করলেন বিজ্ঞানীরা

২০ মিষ্টি আলুর জিনোম রহস্য উন্মোচন

২৩ পাসওয়ার্ডে চালু হবে ‘মাইন্ড-রিডিং’!

২৪ একক ইলেকট্রন শনাক্তকরণে নতুন সাফল্য

২৫ ইউরেনাসের নতুন চাঁদ আবিষ্কার

২৬ চকলেটের স্বাদ নির্ধারণে অণুজীবের বড় ভূমিকা

বিজ্ঞান ব্লগ

১৭ প্রথম মানব প্রজাতি কী ছিল?

৩১ লিকুইড ট্রি

ফিচার

৩৫ গ্র্যাভিটি কি কোয়ান্টাম?

৪৭ নার্সিসিস্টদের নিয়ে কিছু সত্য কথা

K2-18b তে প্রাণের চিহ্ন প্রায় অদৃশ্য হয়ে গেছে!

K2-18b গ্রহে প্রাণের অস্তিত্বের সম্ভাবনা নিয়ে আগের দাবি এখন প্রশ্নবিদ্ধ। নতুন তথ্য বলছে, DMS নামক প্রাণঘাতী অণুর কোনো নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নেই। তবে গ্রহটির বায়ুমণ্ডলে পানি, মিথেন ও CO_2 পাওয়া গেছে, যা ভবিষ্যতের গবেষণার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।

A. Smith, N. Madhusudhan (University of Cambridge)

১২৪ আলোকবর্ষ দূরের গ্রহ K2-18b-তে প্রাণের অস্তিত্বের যে সম্ভাবনা নিয়ে বিজ্ঞানীরা আশাবাদী ছিলেন, তা এখন অনেকটাই ম্লান হয়ে যাচ্ছে। নতুন পর্যবেক্ষণে এমন কোনও জৈব অণুর নিশ্চিত প্রমাণ মেলেনি, যার ইঙ্গিত আগের গবেষণায় পাওয়া গিয়েছিল। বেশিরভাগ বিজ্ঞানী একমত যে, আগের দাবি ছিল তাড়াহুড়োর ফল। তবে আগের গবেষণার অন্যতম প্রধান গবেষক দাবি করছেন, নতুন তথ্য বরং আগের চেয়েও জোরালো প্রমাণ দিচ্ছে।

এ বছর এপ্রিল মাসে ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিক্কু মধুসূদন ও তাঁর সহকর্মীরা দাবি করেন, K2-18b গ্রহের বায়ুমণ্ডলে ডাইমিথাইল সালফাইড (DMS) ও ডাইমিথাইল ডিসালফাইড (DMDS) নামের দুটি অণুর ইঙ্গিত মিলেছে। পৃথিবীতে এই অণুগুলো কেবল জীবিত প্রাণীর মাধ্যমেই তৈরি হয়। তখন মধুসূদন বলেছিলেন, “এটাই প্রথম ইঙ্গিত, যে আমরা কোনও বসবাসযোগ্য এলিয়েন গ্রহকে খুঁজে পেতে চলেছি।”

কিন্তু পরে অন্যান্য গবেষকেরা জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ (JWST)-এর একই তথ্য ভিন্ন পরিসংখ্যানগত মডেল ব্যবহার করে বিশ্লেষণ করলে DMS বা DMDS-এর উপস্থিতির কোনও শক্ত প্রমাণ পাননি। যদিও মধুসূদনের দলও আরও ব্যাপকভাবে ওই তথ্য পুনঃবিশ্লেষণ করে এবং তিনি জানান, এতে তাঁর আত্মবিশ্বাস আরও বেড়েছে যে, DMS-ই হল তথ্যটির সবচেয়ে ভালো ব্যাখ্যা।

তবে সেই বিতর্কের অবসান ঘটাতে, এবার ক্যালিফোর্নিয়া ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজির রেনিউ হু ও তাঁর সহকর্মীরা মধুসূদনের সঙ্গে যৌথভাবে JWST-এর নতুন তথ্য বিশ্লেষণ করেন। তাঁদের মতে, “এই গবেষণাপত্রে DMS-এর উপস্থিতির কোনও পরিসংখ্যানগত প্রমাণ নেই।”

তাঁরা JWST-এর নিয়ার-ইনফ্রারেড ক্যামেরা দিয়ে K2-18b গ্রহের নক্ষত্রের আলো বিশ্লেষণ করেন, যা গ্রহটির বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে আসার ফলে অণুগুলোর উপস্থিতির ইঙ্গিত দিতে পারে। আগের বিশ্লেষণে মিড-ইনফ্রারেড আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য ব্যবহার করা হয়েছিল, এবার ব্যবহার হয়েছে ভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্য।

তাঁরা বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন সম্ভাব্য মডেল ব্যবহার করেন, কিছুতে DMS অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিছুতে ছিল না। দেখা যায়, কিছু DMS-যুক্ত মডেল তথ্য ব্যাখ্যা করতে একটু ভালো করে, তবে সবক্ষেত্রে তা সত্য নয় এবং কোনও ক্ষেত্রেই DMS-এর উপস্থিতি প্রমাণ করার মতো শক্ত প্রমাণ মেলেনি।

"নতুন গবেষণাপত্র একেবারে স্পষ্ট করে বলছে যে, DMS-এর কোনও পরিসংখ্যানগত প্রমাণ নেই"

রেনিউ হু বলেন, "এই মডেল-নির্ভরতাই দেখায় যে, সিগন্যালটি খুবই দুর্বল, যদি সত্যিই কোনো সিগন্যাল থেকে থাকে। তাই সাবধানতার সঙ্গে এগোনো উচিত।"

মধুসূদন স্বীকার করেছেন যে, এখনও নিশ্চিতভাবে DMS শনাক্ত হয়েছে বলা যাবে না। তবে তিনি যুক্তি দেন, এই নতুন তথ্য যদি ২০২৩ সালের একই ক্যামেরার তথ্যের সঙ্গে তুলনা করা হয় (এপ্রিলের মিড-ইনফ্রারেডের সঙ্গে নয়), তাহলে দেখা যায় যে, DMS-এর জন্য প্রমাণ একটু বেশি জোরালো। "খালি পরিসংখ্যানের কথা বললে, এই গবেষণাপত্রে আমরা যেটা প্রকাশ করছি, তা বলছে DMS-এর সম্ভাবনা কিছুটা বেশি," বলেন মধুসূদন।

তবে তিনি এটাও বলেন, "DMS-এর মতো আচরণ করছে এমন আরও অণু থাকতে পারে। কিন্তু কোনও একটি অজানা অণু এই সংকেত তৈরি করছে, আর DMS-ই সেটার সেরা ব্যাখ্যা হতে পারে। যদিও আমরা এখনও নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে পারছি না।"

অ্যারিজোনা স্টেট ইউনিভার্সিটির লুইস ওয়েলব্যাংকস বলেন, "এই গবেষণাপত্র একেবারে স্পষ্ট করে বলছে যে, DMS-এর কোনও পরিসংখ্যানগত প্রমাণ নেই।" এমআইটি'র সারা সিগারও একমত, বলছেন, "তারা যে পরিসংখ্যান দেখিয়েছে, তা যথেষ্ট নয় কোনো কিছু শনাক্ত করার জন্য।"

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যাক টেলর বলেন, "DMS শনাক্ত করা যায় কি না, এই বিতর্কের প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি, কারণ আরও নির্ভুল তথ্যও এর উপস্থিতি নিশ্চিত করতে পারেনি।"

DMS-এর জৈব-চিহ্ন (biosignature) হিসেবে প্রস্তাবের আরেকটি ধাক্কা হল এই যে, হু ও তাঁর দল দেখিয়েছেন, K2-18b'র মতো কিছু হাইড্রোজেন-সমৃদ্ধ গ্রহের বায়ুমণ্ডলে DMS জীবনের উপস্থিতি ছাড়াও রাসায়নিকভাবে তৈরি হতে পারে। টেলর বলেন, "এটা আমাদের সাহায্য করছে নির্ধারণ করতে, কোন অণুগুলো আসলেই কেবল জীবনের প্রমাণ হতে পারে। DMS সেক্ষেত্রে বাদ পড়ছে।"

তবে তিনি এটাও বলেন যে, আবার মিড-ইনফ্রারেড যন্ত্রের সাহায্যে পরবর্তী অবজারভেশন করলে আরও নির্দিষ্ট সংকেত ধরা পড়তে পারে, যেখানে DMS ও অন্যান্য জটিল অণুর উপস্থিতি শনাক্ত করা সম্ভব হতে পারে।

সবশেষে, একটি বিষয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা একমত: K2-18b গ্রহটি পানিতে সমৃদ্ধ। হু এবং তাঁর সহকর্মীরা মিথেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের উপস্থিতির শক্ত প্রমাণ পেয়েছেন, যা পানির উপস্থিতির ইঙ্গিত দেয়। তবে এই পানি গ্রহের বায়ুমণ্ডলে আছে, মহাসাগর হিসেবে আছে, না কি ভেতরে আটকে আছে—তা এখনো স্পষ্ট নয়।

লেখক: জারা জাইন্ড

রেফারেন্স: *DOI: 10.48550/arXiv.2507.12622*

পদার্থবিজ্ঞান

ক্ষুদ্রাকৃতির যন্ত্র দিয়ে নিউট্রিনো ধরা সম্ভব!

মাত্র কয়েক কেজি ওজনের যন্ত্র দিয়ে নিউট্রিনো শনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছে বিজ্ঞানীরা, যা প্রচলিত ডিটেক্টরের তুলনায় অনেক ছোট। এই 'কোহেরেন্ট স্ক্যাটারিং' প্রযুক্তি পদার্থবিজ্ঞানের স্ট্যান্ডার্ড মডেলের গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার সুযোগ করে দিচ্ছে এবং ভবিষ্যতে সূর্য ও মহাকাশীয় ঘটনাবলির নিউট্রিনো গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর থেকে নির্গত নিউট্রিনো কণাকে মাত্র কয়েক কেজি ওজনের একটি যন্ত্র ব্যবহার করে শনাক্ত করেছেন পদার্থবিদরা। প্রচলিত নিউট্রিনো ডিটেক্টর যেখানে হাজার হাজার টন ওজনের হয়, সেখানে এত হালকা যন্ত্রে এমন সাফল্য নতুন করে প্রশ্ন তুলছে পদার্থবিজ্ঞানের সুপ্রতিষ্ঠিত নিয়মগুলো নিয়ে এবং পথ খুলে দিচ্ছে মহাকর্ষপীড়িত নক্ষত্রের কেন্দ্র থেকে উৎপন্ন বিপুল সংখ্যক নিউট্রিনো শনাক্ত করার। CONUS+ নামের এই এক্সপেরিমেন্ট ৩০ জুলাই, ২০২৫ তারিখে *Nature* জার্নালে প্রকাশিত এক গবেষণাপত্রে বর্ণনা করা হয়েছে।

ভুতুড়ে কণা নিউট্রিনো

নিউট্রিনো এমন এক ধরনের মৌলিক কণা যাদের কোনো বৈদ্যুতিক চার্জ নেই, এবং তারা সাধারণত অন্যান্য কণার সঙ্গে খুব কমই মিথস্ক্রিয়া করে। যার ফলে তাদের সনাক্ত করা অত্যন্ত কঠিন। সাধারণত নিউট্রিনো শনাক্ত করার জন্য নিউট্রিনো ডিটেক্টর ব্যবহার করা হয়, যেগুলো ইলেকট্রন, প্রোটন বা নিউট্রনের সঙ্গে নিউট্রিনোর সংঘর্ষে সৃষ্ট হালকা ঝলক পর্যবেক্ষণ করে। কিন্তু এই সংঘর্ষ এতই বিরল যে, যথেষ্ট সংখ্যক সংঘর্ষ ধরতে ডিটেক্টরগুলোর আকার টনের পর টন হতে হয়।

২০১৭ সালে স্কলবার্গ এবং তার দল প্রথম 'মিনি-ডিটেক্টর' পদ্ধতি চালু করেন, যা টেনেসির ওক রিজ জাতীয় ল্যাবরেটরির পার্টিকল অ্যাক্সেলারেটর থেকে উৎপন্ন নিউট্রিনো শনাক্ত করেছিল। তবে, পারমাণবিক রিঅ্যাক্টর থেকে আসা নিউট্রিনোর শক্তি কিছুটা কম হওয়ায়, তা শনাক্ত করা আরও কঠিন ছিল বলে জানান স্কলবার্গ। তবে এই নিম্ন-শক্তির নিউট্রিনো ব্যবহার করেই পদার্থবিজ্ঞানের স্ট্যান্ডার্ড মডেলের আরও সূক্ষ্ম পরীক্ষার সুযোগ তৈরি হয়েছে।

'কোহেরেন্ট স্ক্যাটারিং' এর রহস্য

স্কলবার্গের COHERENT ডিটেক্টর প্রথম ব্যবহার করে এক অভিনব পদ্ধতি, যাকে বলা হয় কোহেরেন্ট স্ক্যাটারিং। এখানে নিউট্রিনো একটি সম্পূর্ণ পারমাণবিক নিউক্লিয়াসের সঙ্গে একত্রে মিথস্ক্রিয়া করে।

CONUS প্রকল্পের একজন ক্রিশ্চিয়ান বাক বলেন, কণা পদার্থ ও তরঙ্গের মতো আচরণ করতে পারে, এবং শক্তি যত কম হয়, তরঙ্গদৈর্ঘ্য তত বেশি হয়। যখন নিউট্রিনোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য নিউক্লিয়াসের আকারের কাছাকাছি হয়, তখন "নিউট্রিনো পুরো নিউক্লিয়াসকে একটি একক সত্তা হিসেবে দেখে, তার অভ্যন্তরীণ গঠনকে আলাদা করে দেখে না।" ফলে কোনো উপ-পরমাণবিক কণার সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষ না হলেও নিউক্লিয়াস সামান্য কাঁপে। এই ক্ষুদ্রতর কম্পনই ডিটেক্টরে শনাক্তযোগ্য।

এই পদ্ধতি প্রচলিত ডিটেকশন পদ্ধতির চেয়ে ১০০ গুণ বেশি কার্যকর, কারণ এখানে সংঘর্ষের হার অনেক বেশি। তাই ছোট আকারের ডিটেক্টর দিয়েই নিউট্রিনোর সঠিক পরিমাণ শনাক্ত করা সম্ভব।

পারমাণবিক রিঅ্যাক্টর থেকে সংগ্রহ

CONUS ডিটেক্টরটি তৈরি হয়েছে বিশুদ্ধ জার্মেনিয়ামের চারটি মডিউল নিয়ে, প্রতিটির ওজন ১ কেজি। এটি ২০১৮ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত জার্মানির একটি পারমাণবিক রিঅ্যাক্টরে চালিত ছিল। পরে রিঅ্যাক্টরটি বন্ধ হয়ে গেলে এটি CONUS+ নামে আপগ্রেড করে সুইজারল্যান্ডের লাইবস্টাডট পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে স্থানান্তর করা হয়। নতুন স্থানে ১১৯ দিনের পর্যবেক্ষণে প্রায় ৩৯৫টি সংঘর্ষের ঘটনা শনাক্ত করা হয়েছে, যা পদার্থবিজ্ঞানের স্ট্যান্ডার্ড মডেলের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

২০১৭ সালের ঐতিহাসিক ফলাফলের পর স্কলবার্গের দল বিভিন্ন উপকরণ, সিজিয়াম আয়োডাইড, আর্গন, এবং জার্মেনিয়াম ব্যবহার করে পুনরায় পরীক্ষা চালায়। আলাদাভাবে, গত বছর দুটি ডার্ক ম্যাটার অনুসন্ধান প্রকল্প সূর্য থেকে আসা নিউট্রিনোর ক্ষীণ কোহেরেন্ট স্ক্যাটারিং শনাক্ত করার আভাস পায়। স্কলবার্গ বলেন, স্ট্যান্ডার্ড মডেল এই স্ক্যাটারিংয়ের হার এবং তা কিভাবে নিউক্লিয়াসের ধরন

অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়, তা স্পষ্টভাবে পূর্বাভাস দেয়। তাই যত বেশি উপাদান দিয়ে পরীক্ষা চালানো যায়, ততই ভালো।

ভবিষ্যতের সম্ভাবনা

গবেষকরা মনে করেন কোহেরেন্ট স্ক্যাটারিং বর্তমান নিউট্রিনো শনাক্তকারী প্রযুক্তিগুলোর পুরোপুরি বিকল্প হবে না, তবে তা এক শক্তিশালী সহায়ক হবে। কারণ, এটি নিউট্রিনোর সব তিনটি পরিচিত ধরন (এবং তাদের প্রতিকণা) কম শক্তিতেও শনাক্ত করতে পারে, যা অন্য অনেক ডিটেক্টরের পক্ষে সম্ভব নয়।

এ কারণে এটি জাপানে নির্মাণাধীন Hyper-Kamiokande-এর মতো বিশাল ডিটেক্টরগুলোর উচ্চ-শক্তির নিউট্রিনো পর্যবেক্ষণের কাজকে দারুণভাবে সম্পূরক করতে পারে।

লেখক: পুষ্পিতা আনোয়ার
রেফারেন্স: DOI: 10.1038/s41586-025-09322-2

বাংলাদেশ

প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে ‘প্যানথার ড্যানিও’ মাছ

বাংলাদেশের চট্টগ্রাম অঞ্চলের এক পাহাড়ি ঝর্ণা থেকে প্রথমবারের মতো আবিষ্কৃত হয়েছে বিরল প্রজাতির 'প্যানথার ড্যানিও' (Danio aesculapii) মাছ, যা এখন পর্যন্ত শুধু মায়ানমারে দেখা গিয়েছিল।

Fuad Rahaman

বাংলাদেশের চট্টগ্রাম অঞ্চলের পাহাড়ি ঝর্ণা থেকে প্রথমবারের মতো আবিষ্কৃত হয়েছে বিরল প্রজাতির ‘প্যানথার ড্যানিও’ (*Danio aesculapii*) মাছ। এটি এই প্রজাতির প্রথম জীবন্ত আলোকচিত্র রেকর্ড হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। ২০২৩ সালের শেষদিকে এই মাছটি আবিষ্কার করেন ফুয়াদ রহমান ও তার সহযাত্রীরা। বিষয়টি যাচাই করেছে বিজ্ঞানভিত্তিক সংবাদমাধ্যম বিজ্ঞানবার্তা।

এই মাছটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যা বিভাগে হস্তান্তর করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এই প্রজাতিটি এখনও বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে রেকর্ড করা হয়নি, ফলে এই আবিষ্কার দেশের মৎস্য বৈচিত্র্যের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন।

প্যানথার ড্যানিও কী?

Danio aesculapii বা প্যানথার ড্যানিও হলো সাইপ্রিনিডি পরিবারের একটি ছোট আকারের মাছ। ২০০৯ সালে মায়ানমারের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের রাখাইন ইয়োমা পাহাড়ের পশ্চিম ঢালে প্রথমবারের মতো এই প্রজাতিটি আবিষ্কৃত হয়। সুইডেনের ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়ামের গবেষক স্ভেন ও. কুল্যান্ডার ও ফ্যাং ফ্যাং এটি বৈজ্ঞানিকভাবে বর্ণনা করেন।

এই মাছের দেহে সামনের দিকে ৬-৭টি বাদামী উল্লম্ব দাগ এবং পেছনের দিকে দুটি সারিতে ছোট বাদামী দাগ থাকে, যা সাপের চামড়ার মতো দেখতে। এ কারণেই এর নামকরণ করা

হয়েছে 'প্যানথার ড্যানিও'। প্রাচীন গ্রিক দেবতা অ্যাসক্লেপিয়াসের নামানুসারে এর বৈজ্ঞানিক নামকরণ করা হয়েছে, যার হাতে সাপ মোড়ানো একটি লাঠি ছিল।

বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য

প্যানথার ড্যানিও অন্যান্য ড্যানিও প্রজাতি থেকে কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যে আলাদা:

- এর পৃষ্ঠীয় পাখনায় ছয়টি শাখাযুক্ত রশ্মি থাকে, যেখানে অন্যান্য ড্যানিও প্রজাতিতে সাত বা তার বেশি থাকে।

- এর লেজের কাছে ১২টি সার্কামপেডাঙ্কুলার স্কেল সারি রয়েছে, যা শুধুমাত্র *Danio erythromicron* ও *Danio kerri* প্রজাতিতে দেখা যায়।

- এর দেহের রঙের বিন্যাস অনন্য – সামনের দিকে উল্লম্ব দাগ এবং পেছনের দিকে দুটি সারিতে ছোট ছোট দাগ।

গড় আকারে এই মাছ ২০-২৩ মিলিমিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। এরা ছোট পাহাড়ি ঝর্ণায় বাস করে, যেখানে পানি স্বচ্ছ এবং স্রোত মৃদু থাকে।

আবিষ্কারের গুরুত্ব

বাংলাদেশে এই মাছের আবিষ্কার দেশের মৎস্য বৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এটি প্রমাণ করে যে বাংলাদেশের পাহাড়ি অঞ্চলে এখনও অনেক অজানা প্রজাতি রয়েছে যা আবিষ্কারের অপেক্ষায় আছে।

মায়ানমারের সাথে বাংলাদেশের ভৌগোলিক সংযোগের কারণে এই অঞ্চলে একই প্রজাতির মাছ পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু এটি প্রথমবারের মতো প্রমাণিত হলো। এই আবিষ্কার আঞ্চলিক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

"এই মাছটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যা বিভাগে হস্তান্তর করা হয়েছে"

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যা বিভাগে মাছটি হস্তান্তর করায় এটি নিয়ে আরও গবেষণা সম্ভব হবে। এর আচরণ, প্রজনন ব্যবস্থা এবং বাস্তুতন্ত্রে ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাবে।

ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা

এই আবিষ্কারের পর বাংলাদেশের পাহাড়ি অঞ্চলে আরও জরিপ চালানোর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের ছোট ছোট ঝর্ণায় আরও কী কী বিরল প্রজাতি রয়েছে তা খুঁজে বের করতে হবে।

একই সাথে এই প্রজাতির সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে, কারণ পাহাড়ি ঝর্ণাগুলো দূষণ ও মানুষের হস্তক্ষেপের কারণে হুমকির মুখে পড়ছে। এই মাছের আবাসস্থল রক্ষায় পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি।

বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদের বৈচিত্র্য সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান এখনও অসম্পূর্ণ। প্যানথার ড্যানিওর আবিষ্কার তা আরও একবার মনে করিয়ে দিলো যে আমাদের চারপাশে এখনও অনেক কিছু অজানা রয়ে গেছে, যা আবিষ্কারের অপেক্ষায়।

লেখক: ফাইজাহ্ সুলতানা

স্বাস্থ্য

এইচআইভি ভাইরাসের বিরুদ্ধে নতুন আশার আলো

এমআরএনএ প্রযুক্তি ব্যবহার করে তৈরি দুটি নতুন টিকা প্রাথমিক ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে এইচআইভির বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রতিরোধ ক্ষমতা দেখিয়েছে। যদিও কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেছে। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন এগুলো এইচআইভি টিকার উন্নয়ন বন্ধ করার মতো নয়। গবেষকরা এখন আরও নিরাপদ ও কার্যকর সংস্করণ তৈরিতে কাজ করছেন।

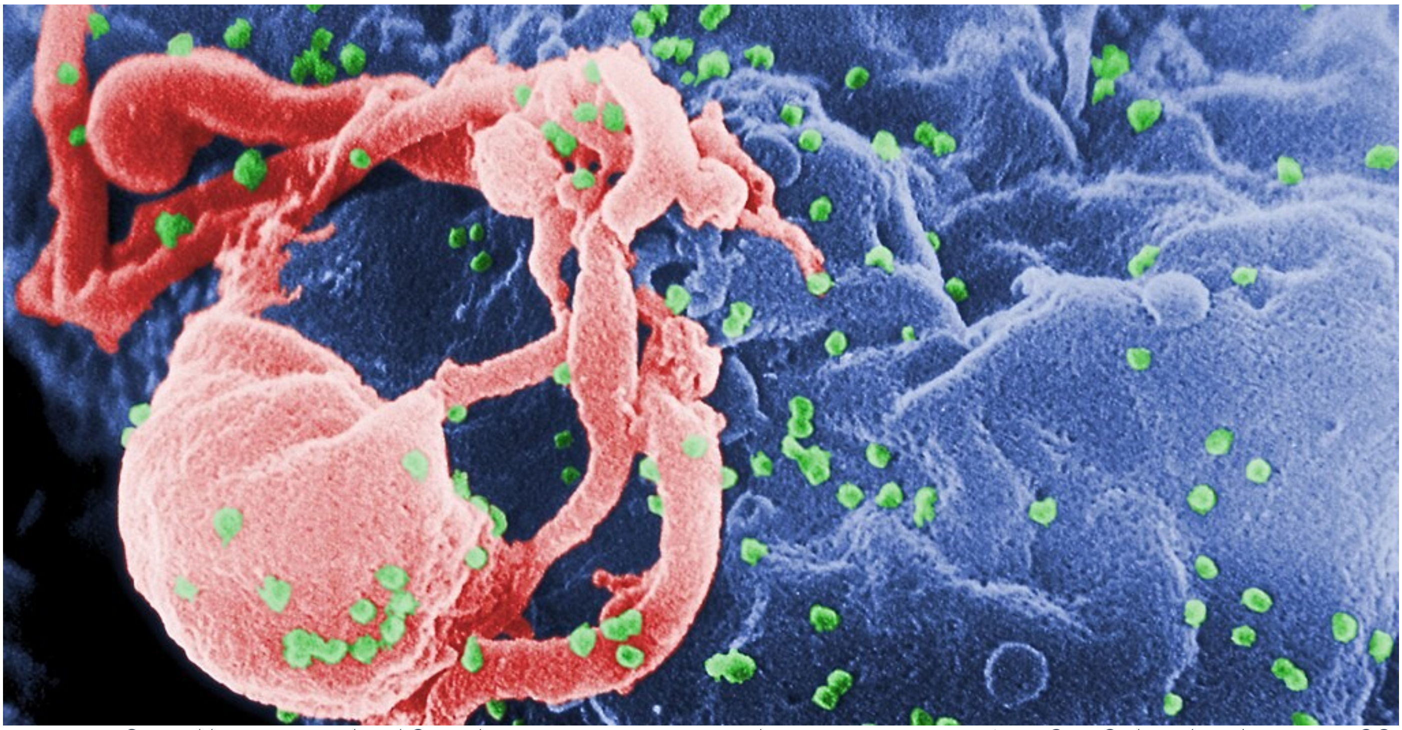

কালচার করা লিম্ফোসাইট কোষ থেকে এইচআইভি-১ ভাইরাসের (সবুজ রঙে) কোষের বাইরে বের হয়ে আসার মুহূর্তের একটি স্ক্যানিং ইলেকট্রন মাইক্রোগ্রাফ। ছবিটির গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বোঝাতে রঙ সংযোজন করা হয়েছে। কোষের পৃষ্ঠে থাকা গোলাকৃতি অনেকগুলো ছোট ফোলাভাব ভাইরিয়নের (ভাইরাস কণার) তৈরি ও বেরিয়ে আসার স্থান নির্দেশ করে (C. Goldsmith)

এমআরএনএ (mRNA) প্রযুক্তি ব্যবহার করে তৈরি করা দুটি টিকা ক্যান্ডিডেট (vaccine candidates) এইচআইভির বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে বলে দেখা গেছে একটি প্রাথমিক পর্যায়ের ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে।

এইচআইভির বিরুদ্ধে mRNA টিকার এটি মাত্র তৃতীয় পরীক্ষা। "এই গবেষণাগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এগুলো প্রথম দিককার কাজ," বলেন সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞ শ্যারন লিউইন, যিনি অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে পিটার ডোহার্টি ইনস্টিটিউট ফর ইনফেকশন অ্যান্ড ইমিউনিটির প্রধান।

বিশ্বজুড়ে প্রায় ৪১ মিলিয়ন মানুষ এইচআইভি ভাইরাসে আক্রান্ত, যার কোনো কার্যকর টিকা এখনো নেই।

লিউইনের মতে, কোনো ভাইরাসের বিরুদ্ধে টিকা তৈরি করতে হলে আগে দেখতে হয় শরীর কীভাবে সেই ভাইরাসকে দমন করে। কিন্তু এইচআইভি এমন এক ভাইরাস, যা সরাসরি রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থা আক্রমণ করে এবং খুব কম মানুষের রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থা একে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করতে পারে। তাই এই ভাইরাসের বিরুদ্ধে কার্যকর টিকা তৈরি করতে গেলে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার দরকার হয়।

এই জটিলতাই mRNA প্রযুক্তিকে HIV টিকার জন্য উপযোগী করে তোলে। প্রথম mRNA টিকার অনুমোদন দেয়া হয় ২০২০ সালে, কোভিড-১৯-এর জন্য। অন্যান্য টিকা প্রযুক্তির তুলনায় mRNA টিকাকে দ্রুত ও তুলনামূলকভাবে কম খরচে বদলানো যায় ফলে গবেষকরা বিভিন্ন কৌশল পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। এই টিকাগুলো কাজ করে শরীরের কোষে একটি নির্দিষ্ট প্রোটিন তৈরির নির্দেশনা পাঠিয়ে, যা ভাইরাসের গায়ে থাকে। এই প্রোটিন প্রতিরক্ষাব্যবস্থাকে সক্রিয় করে, ফলে শরীর সত্যিকারের ভাইরাস এলে তাকে চিনে নিতে পারে।

এইচআইভি ভাইরাস তার বাইরের আবরণে থাকা একটি 'এনভেলপ প্রোটিন'-এর মাধ্যমে কোষে প্রবেশ করে সংক্রমণ ঘটায়। *Science Translational Medicine* জার্নালে প্রকাশিত নতুন গবেষণায় দেখা যায়, সান ডিয়েগোর স্ক্রিপস রিসার্চের প্রোটিন ডিজাইন বিশেষজ্ঞ উইলিয়াম শিফের নেতৃত্বে একদল গবেষক দুটি ভিন্ন টিকা কৌশল পরীক্ষা করেছেন।

একটি কৌশলে, যা HIV টিকার প্রচলিত পদ্ধতি, কোষকে নির্দেশনা দেওয়া হয় যেন তারা ভাইরাসের সেই এনভেলপ প্রোটিন বানায় যেগুলো কোষ থেকে আলাদা হয়ে ভেসে বেড়ায়। অপর কৌশলে, mRNA কোষকে নির্দেশ দেয় যেন

তারা এমন এনভেলপ প্রোটিন তৈরি করে যা কোষের গায়ে আটকে থাকে, যেমনটা ভাইরাসে প্রকৃতভাবে দেখা যায়। এই দ্বিতীয় কৌশলের অ্যানিমেল টেস্টের ফলাফল একটি সেকেন্ডারি গবেষণায় প্রকাশিত হয়েছে।

এই ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে যুক্তরাষ্ট্রের ১০টি স্থানে ১৮ থেকে ৫৫ বছর বয়সী ১০৮ জন সুস্থ প্রাপ্তবয়স্ক অংশগ্রহণ করেন। সেখানে দুই ধরনের মেমব্রেন-বাউন্ড (কোষের সঙ্গে যুক্ত) টিকা এবং একটি আনবাউন্ড (মুক্ত ভেসে বেড়ানো) টিকা পরীক্ষা করা হয়।

প্রতিটি অংশগ্রহণকারীকে কয়েক সপ্তাহ অন্তর তিনটি ডোজ দেওয়া হয়; কখনো কম মাত্রার, কখনো বেশি মাত্রার। কারা কোন টিকা পাবেন তা এলোমেলোভাবে নির্ধারণ করা হয়। এই টিকাগুলো সরবরাহ করেছে মার্কিন সংস্থা মডার্না, যেখানকার প্রোটিন ডিজাইন বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম শিফ।

ফলাফলে দেখা যায়, যারা মেমব্রেন-বাউন্ড টিকা পেয়েছেন, তাদের প্রায় ৮০ শতাংশের শরীরে এমন অ্যান্টিবডি তৈরি হয়েছে যা ভাইরাসের এনভেলপ প্রোটিনকে কোষে প্রবেশ করতে বাধা দিতে পারে। অপরদিকে, যারা ফ্রি-ফ্লোটিং প্রোটিন টিকা পেয়েছেন, তাদের মধ্যে মাত্র ৪ শতাংশের দেহে একই রকম অ্যান্টিবডি তৈরি হয়।

“এই পার্থক্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ,” বলেন লিউইন। তিনি আশা করছেন এই ফলাফল ভবিষ্যতের টিকা উন্নয়নে দিকনির্দেশনা দেবে।

সবগুলো টিকাই বেশিরভাগ অংশগ্রহণকারীর মধ্যে ভালোভাবে সহনীয় হয়েছে, কম-বেশি, উভয় মাত্রাতেই। তবে, মোট ৭ জনের (প্রায় ৬.৫%) ক্ষেত্রে চুলকানিযুক্ত বড় র‍্যাশ বা অ্যালার্জির মতো সমস্যা দেখা গেছে। এর মধ্যে ৫ জনের ক্ষেত্রে উপসর্গ ছয় সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে ছিলো, কারো কারো ক্ষেত্রে এমনকি কয়েক বছর পর্যন্ত। এই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াগুলো সবগুলো টিকাতেই দেখা গেছে, সব ধরনের মাত্রায়।

একই গবেষক দল গত মে মাসে আরও দুটি পরীক্ষা চালায়, যেখানে একাধিক mRNA টিকার সংমিশ্রণ ব্যবহার করে শরীরে বিস্তৃত প্রতিরোধ ব্যবস্থা তৈরির চেষ্টা করা হয়, যাতে বিভিন্ন রকম HIV ভ্যারিয়েন্টের বিরুদ্ধে সুরক্ষা পাওয়া যায়। সেগুলোতে ভালো অগ্রগতি হয়েছে বলে জানানো হয়। ট্রায়ালগুলো যুক্তরাষ্ট্র, রুয়ান্ডা এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় পরিচালিত হয়।

তবে ওই ট্রায়ালের একটিতে ১৮ শতাংশ অংশগ্রহণকারীর ত্বকে অ্যালার্জি বা চুলকানিযুক্ত র‍্যাশের মতো সমস্যা দেখা যায়। ওই সময় শিফ এবং তাঁর সহকর্মীরা বলেছিলেন, এই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার কারণ সম্ভবত HIV এবং mRNA-এর মিলিত প্রতিক্রিয়া, এককভাবে কোনো একটি নয়। তবে ঠিক কী কারণে এমনটি হচ্ছে, তা তারা শনাক্ত করতে পারেননি। লিউইন বলেন, বিজ্ঞানীদের এখন এই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার কারণ খুঁজে বের করতে হবে যাতে ভবিষ্যতে তা এড়ানো যায়। তবে এগুলো টিকা উন্নয়ন বন্ধ করার মতো গুরুতর বিষয় নয়। “এইচআইভি টিকার চাহিদা অত্যন্ত বেশি,” তিনি বলেন।

শিফ এবং তাঁর দল ভবিষ্যতে আরও কম ডোজের mRNA ব্যবহার করে পরীক্ষা চালানোর পরিকল্পনা করছেন, যাতে করে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া কমে আসে। তাঁরা মূলত মেমব্রেন-বাউন্ড প্রোটিন কৌশলের দিকেই নজর দিচ্ছেন।

লেখক: জারা জাইন্ড

রেফারেন্স: *DOI: [10.1126/scitranslmed.ady6831](https://doi.org/10.1126/scitranslmed.ady6831), [10.1126/scitranslmed.adw0721](https://doi.org/10.1126/scitranslmed.adw0721)*

প্রযুক্তি

ওপেনএআই-এর নতুন ওপেন-ওয়েট লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল

ওপেনএআই তাদের প্রথম ওপেন-ওয়েট যুক্তিনির্ভর ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল gpt-oss উন্মোচন করেছে, যা গবেষকদের কাস্টমাইজ করার সুযোগ দিচ্ছে। এর ছোট সংস্করণটি একেবারে ল্যাপটপেও চালানো সম্ভব। এটি চীনা ওপেন মডেলগুলোর সাথে প্রতিযোগিতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এবং গবেষণায় নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলবে।

Sarah Rogers/MITTR/Getty, OpenAI

OpenAI সম্প্রতি এমন একটি লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল (Large Language Model বা LLM) উন্মোচন করেছে, যা প্রতিষ্ঠানটির নামের ("ওপেন") সাথেই তাল মিলিয়ে চলে। 'gpt-oss' নামে পরিচিত এই মডেলটি হচ্ছে OpenAI-এর প্রথম যুক্তিনির্ভর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI), যা ওপেন ওয়েট (open-weight)। অর্থাৎ গবেষকরা এটি ডাউনলোড করে নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী কাস্টমাইজ করতে পারবেন।

ক্যালিফোর্নিয়ার সান ফ্রান্সিসকো-ভিত্তিক OpenAI গত ৫ আগস্ট, ২০২৫ একটি ব্লগ পোস্ট এবং কারিগরি বিবরণীতে এই মডেলটি প্রকাশ করে। অনেক কাজেই gpt-oss, OpenAI-এর সর্বাধুনিক মডেলগুলোর কাছাকাছি পারফর্ম করছে। এটি দুটি আকারে পাওয়া যাচ্ছে, যেগুলোর মধ্যে ছোটটি একটি সাধারণ ল্যাপটপে অফলাইনেই চালানো সম্ভব। ফলে এই মডেল সংবেদনশীল ডেটা বিশ্লেষণ বা প্রশিক্ষণে ব্যবহার করা যাবে, যা ক্লাউডে পাঠানো সম্ভব নয়।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতবিদ ও কম্পিউটার বিজ্ঞানী সায়মন ফ্রিডার বলেন, "আমি অত্যন্ত রোমাঞ্চিত। ওপেন-সোর্স LLM-এর প্রতিযোগিতা ইতিমধ্যেই তীব্র, আর এটি সেই প্রতিযোগিতাকে আরও তীব্র করে তুলবে, যা পুরো গবেষণা কমিউনিটির জন্যই সুফল বয়ে আনবে।"

চীনা কোম্পানি যেমন হাংঝু-ভিত্তিক DeepSeek এবং বেইজিং-ভিত্তিক Moonshot AI-এর তৈরি শক্তিশালী ওপেন-ওয়েট মডেলগুলো বর্তমানে গবেষকদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। Nathan Lambert নামের এক গবেষকের বিশ্লেষণ অনুযায়ী (যেটি gpt-oss প্রকাশের আগেই সম্পন্ন হয়েছিল), চীনা মডেলগুলো ইতোমধ্যেই ওপেন সোর্স মার্কিন মডেল যেমন Meta-এর Llama-কে ছাড়িয়ে পারফর্ম করছে এবং শিগগিরই ডাউনলোড সংখ্যায়ও এগিয়ে যাবে।

গত মাসে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন তাদের AI Action Plan-এ ওপেন-ওয়েট মডেলকে "একাডেমিক গবেষণার জন্য অপরিহার্য" বলে উল্লেখ করে। OpenAI-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা গ্রেগ ব্রকম্যান জানান, gpt-oss প্রকাশের সিদ্ধান্ত অনেক আগে থেকেই চলছিল, এবং এটি চীনা মডেলগুলোর সাফল্যের প্রতিক্রিয়া নয়। "আমরা

কখনোই এমনটা ভাবিনি যে, আমরা এটি করব না,” বলেন তিনি।

সব মডেলেই কোনো না কোনো পক্ষপাত (bias) থাকে, তাই বিভিন্ন উৎস থেকে মডেল আসা ব্যবহারকারীদের জন্য ভালো, বলেন ফ্রিডার। “পশ্চিমা বিশ্বের একটি শীর্ষস্থানীয় ওপেন-ওয়েট মডেল আসা মানে হচ্ছে, যেসব কোম্পানি এই জায়গায় নেতৃত্ব দিচ্ছে, সেখানে ভারসাম্য তৈরি হওয়া।”

গণিতে পারদর্শী

এখন পর্যন্ত OpenAI প্রধানত নিজেদের মডেল প্রাইভেট রেখেছে, ব্যতিক্রম ছিল ২০১৯ সালের GPT-2 যেটা ওপের সোর্স। আর এই নতুন gpt-oss মডেলগুলোর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এগুলো যুক্তিনির্ভর বা ‘reasoning’-এর উপর ভিত্তি করে কাজ করে, ধাপে ধাপে চিন্তা প্রক্রিয়া অনুকরণ করে ফলাফল দেয়। যা জিপিটি-২ এ নেই।

এর আগে প্রকাশিত যুক্তিনির্ভর মডেল যেমন OpenAI-এর o3, বিজ্ঞান ও গণিত সমস্যায় দারুণ পারফর্ম করেছে। বর্তমানে গবেষকেরা এসব মডেল ব্যবহার করছেন কোড লেখার, গবেষণা পত্র পর্যালোচনার এবং এমনকি AI ‘co-scientists’ হিসেবেও, যাতে গবেষণার গতি বাড়ানো যায়।

gpt-oss মডেলগুলো টেক্সট-ভিত্তিক হলেও (মানে ছবি বা ভিডিও বিশ্লেষণ করতে পারে না), অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠানটির সর্বাধুনিক পেইড মডেলগুলোর কাছাকাছি পারফর্ম করে। এটি ওয়েব ব্রাউজ করতে, কোড চালাতে এবং সফটওয়্যার পরিচালনা করতে পারে। OpenAI-এর দাবি, যুক্তিনির্ভর কাজে gpt-oss একই আকারের অন্যান্য ওপেন মডেলের চেয়ে ভালো করে।

AIME 2025 নামক একটি চ্যালেঞ্জিং গণিত ভিত্তিক বেঞ্চমার্কে, gpt-oss DeepSeek-এর R1-এর চেয়ে ভালো স্কোর করেছে। আবার Humanity’s Last Exam নামের ৩,০০০ প্রশ্নের একটি টেস্টেও এর একটি সংস্করণ শীর্ষ ওপেন মডেলগুলোর সাথে পাল্লা দিয়েছে।

(প্রায়) পুরোপুরি ওপেনসোর্স নয়

OpenAI-এর প্রধান বিজ্ঞানী জাকুব পাচকি সম্প্রতি জানিয়েছেন, নিরাপত্তার কারণে প্রতিষ্ঠানটি তাদের সবচেয়ে শক্তিশালী মডেলগুলো সম্পূর্ণ ওপেন-ওয়েট আকারে প্রকাশ করবে না। কারণ, একবার প্রকাশ করে দিলে এর ব্যবহার বা উন্নয়নের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখা সম্ভব নয়।

তবে ৫ আগস্ট, ২০২৫ প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্রে OpenAI জানায়, gpt-oss মডেলকে যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ক্ষতিকর কাজে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, তবুও এটি জৈব নিরাপত্তা বা সাইবার নিরাপত্তার মতো ঝুঁকির ক্ষেত্রে বিদ্যমান অন্যান্য ওপেন বা বেসরকারি মডেলগুলোর চেয়ে বেশি হুমকি সৃষ্টি করে না।

যদিও gpt-oss ওপেন-ওয়েট (open-weight) হলেও পুরোপুরি ওপেন-সোর্স নয়, যেমন এর ট্রেইনিং ডেটার বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে না। ফলে গবেষকেরা এটিকে হুবহু পুনর্নির্মাণ করতে পারবেন না।

ওপেন-ওয়েট মডেল পার্সোনালাইজেশনের জন্য অনেক বেশি সম্ভাবনাময়, বলেন সিয়াটলের ফ্রেড হাচিনসন ক্যান্সার সেন্টারের তথ্যবিজ্ঞানী ক্যারি রাইট।

তবে রাইট এটাও বলেন, গবেষকেরা বহুদিন ধরেই OpenAI-এর বাইরের বিভিন্ন টুল ব্যবহার করে আসছেন। এমনকি OpenAI-এর নিজস্ব বিশ্লেষণেও দেখা গেছে, নতুন মডেলগুলো অনেক সময় আগের তুলনায় বেশি ‘hallucination’ বা তথ্য উদ্ভাবনের প্রবণতা দেখায়।

ফ্রেড হাচিনসনেরই আরেকজন তথ্যবিজ্ঞানী এলিজাবেথ হামফ্রিস বলেন, “এই মডেলগুলোর আউটপুট এখনো যাচাই করার প্রয়োজন হয়। এগুলো আমাদের কাজকে সহায়তা করতে পারেও পুরোপুরি প্রতিস্থাপনযোগ্য নয় এবং সেটাই বাস্তবসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি।”

লেখক: নুজহাত সুবাহ ঐশী

জ্যোতির্বিজ্ঞান

ব্ল্যাক হোল অভিযানের নকশা!

একজন বিজ্ঞানী প্রস্তাব করেছেন, এক গ্রাম ওজনের ন্যানোক্রাফট লাইট সেইল ব্যবহার করে একশত বছরের মধ্যে নিকটবর্তী ব্ল্যাক হোলে পৌঁছাতে পারে। এতে আইনস্টাইনের তত্ত্ব পরীক্ষা ও মহাকর্ষীয় প্রভাব পর্যবেক্ষণ সম্ভব হবে। তবে এর জন্য প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ বিশাল।

একটি ইন্টারস্টেলার প্রোব ব্ল্যাক হোলের দিকে পাঠানো হলে, সেটি একশত বছরেরও কম সময়ে গন্তব্যে পৌঁছে পৃথিবীতে তথ্য পাঠাতে পারে—যদি আমরা যথেষ্ট কাছাকাছি একটি ব্ল্যাক হোল খুঁজে পাই।

চীনের সাংহাইয়ের ফুদান বিশ্ববিদ্যালয়ের কসিমো বাম্বি এমন এক অভিযানের নকশা তৈরি করেছেন, যা আগামী ২০ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে আসা প্রযুক্তি দিয়ে সম্ভব হতে পারে।

ব্ল্যাক হোলের কাছাকাছি পৌঁছানো গেলে আলবার্ট আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব পরীক্ষা করা যাবে এবং এক্সট্রিম মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রে পদার্থবিজ্ঞানের মৌলিক ধ্রুবকগুলির কী পরিবর্তন ঘটে, তা জানা সম্ভব হবে।

আমাদের থেকে বর্তমানে সবচেয়ে কাছের পরিচিত ব্ল্যাক হোলের দূরত্ব প্রায় ১৫০০ আলোকবর্ষ, এত দূরে মহাকাশযান পাঠানো বাস্তবে অসম্ভব। তবে মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিতে গড়ে প্রতি ১০০টি নক্ষত্রের জন্য অন্তত একটি ব্ল্যাক হোল রয়েছে বলে ধারণা। অর্থাৎ আমাদের থেকে ২০–২৫ আলোকবর্ষের মধ্যেই একটি ব্ল্যাক হোল থাকার সম্ভাবনা রয়েছে, বলছেন বাম্বি।

তবে একে খুঁজে বের করা সহজ নয়, কারণ ব্ল্যাক হোল নিজে আলো নির্গত করে না। জ্যোতির্বিদদের এটি শনাক্ত করতে হয় কাছের নক্ষত্রের ওপর এর প্রভাব বা আলোর বিকৃতি পর্যবেক্ষণ করে।

২৫ আলোকবর্ষ দূরের ব্ল্যাক হোলে পৌঁছাতে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন দরকার হবে, তবে এটি "সম্ভবপর" বলে মনে করেন বাম্বি। এর জন্য প্রয়োজন হবে মাত্র এক গ্রাম ওজনের ন্যানোক্রাফট, যার সঙ্গে ১০ বর্গমিটার আকারের একটি লাইট সেইল থাকবে। লাইট সেল বা সোলার সেল হলো মহাকাশযান চালনার একটি পদ্ধতি, যেখানে বড় কোনো পৃষ্ঠের উপর সূর্যালোকের বিকিরণচাপ ব্যবহার করে সামনে আগায়। এই সেইলকে আলোর শক্তি দিয়ে ঠেলে তৃতীয়াংশ আলোর গতিতে চালানো যাবে, যদি একটি অতি-শক্তিশালী লেজারের সাহায্য নেওয়া হয়।

বাম্বি বলেন, "লাইট সেইল ও ন্যানোক্রাফট বর্তমানে ইন্টারস্টেলার অভিযানের জন্য সবচেয়ে সম্ভাবনাময় উপায়, কারণ এগুলি আলোর গতির একটি বড় অংশে চলতে পারে।" তবে এর জন্য যে লেজার প্রয়োজন হবে, তার বর্তমান আনুমানিক খরচ প্রায় ১ ট্রিলিয়ন ইউরো।

সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব পরীক্ষা করার জন্য দুটি ক্ষুদ্র প্রোব পাঠানো লাগতে পারে, অথবা প্রধান ন্যানোক্রাফট ব্ল্যাক হোলের কাছে পৌঁছে একটি দ্বিতীয় প্রোব ছেড়ে দিতে পারে। দ্বিতীয় প্রোবটি ব্ল্যাক হোলের দিকে এগোবে, আর মূল যানটি দূরে থেকে তথ্য সংগ্রহ করে পৃথিবীতে পাঠাবে।

অস্ট্রেলিয়ার সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের জেরেন্ট লুইস বলেন, প্রস্তাবে অসম্ভব কিছু নেই, তবে প্রতিটি ধাপই অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী। তার মতে, শতবর্ষব্যাপী এ মিশনের একটি বড় সীমাবদ্ধতা হলো, যানটি গন্তব্যে পৌঁছানোর সময় প্রযুক্তি হয়তো এত উন্নত হবে যে তখন এটি অপ্রয়োজনীয় হয়ে যাবে। "শত বছরের প্রযুক্তিগত উন্নয়নের পরে হয়তো এমন ইঞ্জিন আবিষ্কৃত হবে, যা আমরা এখন কল্পনাও করতে পারি না।"

তিনি আরও বলেন, বাম্বির পরিকল্পনায় যানটিকে ব্ল্যাক হোলের কাছে পৌঁছে কীভাবে স্লো করা হবে, তা উল্লেখ নেই। বাম্বির মতে, স্লো করার চেষ্টা না করে প্রধান যান থেকে ছোট প্রোব ছেড়ে দেওয়াই সহজ সমাধান। এই প্রোবগুলি চলতে চলতেই তথ্য পাঠাবে, কিছু হয়তো ব্ল্যাক হোলের মধ্যেও ঢুকে যাবে, তবুও সেটি মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র পরীক্ষা করার জন্য যথেষ্ট হবে।

অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যাম ব্যারন বলেন, এটি তার পড়া সবচেয়ে "কল্পনাপ্রবণ" গবেষণাপত্রগুলির একটি। তবে একশো বছর আগে যেমন লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডারের ধারণা সায়েন্স ফিকশন মনে হতো, এখন সেটি বাস্তব। "অত্যন্ত ছোট কিছু ব্যবহার করাই সম্ভবত সঠিক পথ," তিনি বলেন, "তবে প্রশ্ন হলো, আমরা কি সত্যিই এমন কিছু বানাতে পারব, যা এই নকশার সব শর্ত পূরণ করবে?"

মানুষের পক্ষে সরাসরি ব্ল্যাক হোলে যাওয়া সম্ভব নয়, কারণ ১০,০০০ g ত্বরণের ধাক্কা আমাদের শরীর সহ্য করতে পারবে না। যদি না কোথাও একটি স্থান-কালের সুড়ঙ্গ (ওয়ার্মহোল) পাওয়া যায়।

বাম্বি হাস্যরসের সঙ্গে বলেন, "মানুষ নিয়ে এমন মিশন করতে হলে 'ইন্টারস্টেলার' মুভির মতো কাছাকাছি একটি ওয়ার্মহোল প্রয়োজন হবে। আমার প্রস্তাবে, দুর্ভাগ্যবশত, কোনো ওয়ার্মহোল নেই।"

লেখক: ইরতা আমালিয়া

রেফারেন্স: DOI: 10.1016/j.isci.2025.113142

জ্যোতির্বিজ্ঞান

মহাবিশ্বের সম্ভাব্য বৃহত্তম ব্ল্যাক হোলের সন্ধান মিলেছে!

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বৃহৎ ব্ল্যাক হোল আবিষ্কার করেছেন, যার ভর ৩৬০০ কোটি সূর্যের সমান। এই অতিবৃহৎ ব্ল্যাক হোল মহাবিশ্বে কোনো বস্তুর সম্ভাব্য ভরের তাত্ত্বিক সর্বোচ্চ সীমার কাছাকাছি এবং এটি মিল্কিওয়ের কেন্দ্রে থাকা অতিবৃহৎ ব্ল্যাক হোল সাগিটেরিয়াস-এ-এর চেয়ে প্রায় ১০,০০০ গুণ বেশি ভারী।*

হাবল টেলিস্কোপের তোলা ছবিতে দেখা যাচ্ছে "কসমিক হর্সশু" নামের এক গ্রাভিটেশনাল লেন্স (কেন্দ্র থেকে ডান দিকে)। সদ্য আবিষ্কৃত আল্ট্রাম্যাসিভ ব্ল্যাক হোলটি কমলা রঙের গ্যালাক্সির কেন্দ্রে অবস্থান করছে। এর অনেক দূরে, পিছনের নীল গ্যালাক্সিটি স্থান-কালের বিকৃতির ফলে ঘোরার পায়ের রিংয়ে বাঁকানো আকৃতির মতো হয়েছে, যা সৃষ্টি করেছে সামনের এই বিশাল ভরবিশিষ্ট কমলা গ্যালাক্সি (ESA/Hubble/NASA)

প্রায় ৫০০ কোটি আলোকবর্ষ দূরের এক গ্যালাক্সিতে লুকিয়ে থাকা এক দৈত্যাকার ব্ল্যাক হোলের ভর সরাসরি পরিমাপ করা হয়েছে, যা আকারে মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির কেন্দ্রে থাকা সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাক হোলের চেয়ে ১০,০০০ গুণ বড় এবং আমাদের সূর্যের ভরের প্রায় ৩৬০০ কোটি গুণ।

যুক্তরাজ্যের পোর্টসমাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের থমাস কোলেট বলেন, "এটি সম্ভবত মহাবিশ্বের সবচেয়ে বৃহৎ ব্ল্যাক হোল। এটি যেন এক ক্ষুদ্র গ্যালাক্সির সমগ্র ভর এক বিন্দুতে সংকুচিত হয়েছে।"

এই আল্টাম্যাসিভ ব্ল্যাক হোলটি "কসমিক হর্সশু (Cosmic Horseshoe)" নামের দুটি গ্যারাক্সির গ্রাভিটেশনালয় লেন্সড সিস্টেমে অবস্থান করছে। এটি গ্যালাক্সিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী গ্র্যাভিটেশনাল লেন্সিং সিস্টেম হোল্ড করার জন্য পরিচিত। এর বিশাল মহাকর্ষ পেছনের বস্তুগুলোর আলোকে বড় করে দেখাতে সক্ষম। আগের গবেষণায় ধারণা দেওয়া হয়েছিল যে এই সিস্টেমের গ্যালাক্সির কেন্দ্রে একটি আল্ট্রাম্যাসিভ ব্ল্যাক হোল থাকতে পারে, কিন্তু এর ভর নির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করা কঠিন ছিল।

কোলেট ও তার দল ব্ল্যাক হোলের চারপাশে ঘূর্ণায়মান নক্ষত্রগুলোর গতি পরিমাপ করেছেন, কারণ তাদের গতি ব্ল্যাক হোলের ভরের উপর নির্ভর করে। একই সঙ্গে, তারা ব্ল্যাক হোলের মহাকর্ষে আলোর বাঁকানো বা "গ্র্যাভিটেশনাল লেন্সিং" প্রভাবও মেপেছেন। দুটি তথ্য একত্রিত করে তারা উচ্চ আত্মবিশ্বাসের সাথে ভর নির্ধারণ করতে পেরেছেন।

যদিও এর ভর অস্বাভাবিকভাবে বড়, তবুও এটি কোলেটের পূর্ববর্তী গবেষণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যেখানে তারা গ্যালাক্সির ডার্ক ম্যাটার বণ্টন মডেল তৈরির চেষ্টা করেছিলেন। কোনো মডেলই মেলে না, যদি না কসমিক হর্সশুর কেন্দ্রে একটি আল্ট্রাম্যাসিভ ব্ল্যাক হোল ধরা হয়।

গবেষকদের ধারণা, কসমিক হর্সশু একটি "ফসিল গ্রুপ গ্যালাক্সি" যা আশপাশের সমস্ত গ্যালাক্সিকে গ্রাস করেছে। এই আচরণই হয়তো ব্যাখ্যা করতে পারে কেন ব্ল্যাক হোলটি এত বিশাল হয়েছে।

তবে রহস্য রয়ে গেছে, এটি বর্তমানে নিষ্ক্রিয়। কোলেট বলেন, "এত বড় হতে হলে এর প্রায় সমগ্র মহাবিশ্বের মোটামুটি শুরু থেকে পুরো সময়জুড়ে পদার্থ গ্রাস করতে হতো। এখন এটি থেমে গেছে, যা অদ্ভুত। কিছু একটা এর বৃদ্ধি থামিয়ে দিয়েছে।"

লেখক: আমিনা আখতার স্মৃতি

রেফারেন্স: DOI: 10.1093/mnras/staf1036

স্বাস্থ্য

মানুষের শরীরের ভিটামিন সি তৈরির ক্ষমতা হারানোর আসল কারণ

মানুষ ও কিছু প্রাণী প্রায় ৬০–৭০ মিলিয়ন বছর আগে ভিটামিন সি তৈরির ক্ষমতা হারায়, যা আগে নিরপেক্ষ পরিবর্তন বলে মনে করা হতো। কিন্তু নতুন গবেষণায় দেখা গেছে, এই ক্ষমতা হারানো আমাদের পূর্বপুরুষদের কিছু পরজীবী, বিশেষত schistosomes-এর বিরুদ্ধে সুরক্ষা দিয়েছিল। এতে বোঝা যায়, জিন হারানো সবসময় ক্ষতিকর নয়, কখনও কখনও এটি জীবনের জন্য উপকারী হতে পারে।

পাঠ্যপুস্তক অনুযায়ী, মানুষের ভিটামিন সি তৈরি করার ক্ষমতা হারিয়ে গেছে কারণ আমাদের খাদ্যতালিকায় পর্যাপ্ত ভিটামিন সি ছিল, ফলে শরীরের তা তৈরির প্রয়োজন পড়েনি। কিন্তু প্রাণীদের ওপর হওয়া কিছু গবেষণা বলছে, এই ক্ষমতা হারানো আসলে আমাদের পূর্বপুরুষদের পরজীবী সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সহায়তা করেছিল।

বেশিরভাগ প্রাণী GULO নামের একটি এনজাইমের মাধ্যমে ভিটামিন সি তৈরি করে। কিন্তু প্রায় ৬০–৭০ মিলিয়ন বছর আগে, আমাদের প্রাইমেট পূর্বপুরুষদের GULO জিনে মিউটেশন ঘটে এবং ভিটামিন সি তৈরির ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। একই ঘটনা আরও কিছু প্রাণীগোষ্ঠীতে ঘটেছে, যেমন অনেক বাদুড় এবং গিনিপিগের মতো দন্তকৃন্তক (rodents)।

প্রচলিত ব্যাখ্যা হলো, যতক্ষণ প্রাণীরা খাদ্য থেকে যথেষ্ট ভিটামিন সি পায়, ততক্ষণ GULO এনজাইম এর প্রয়োজনীয়তা থাকে না, তাই প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে এটি ধরে রাখার চাপও থাকে না। অর্থাৎ পরিবর্তনটি নিরপেক্ষ (neutral) হিসেবে ধরা হয়।

Stefan Cristian Cioata/Getty Images

ডালাস, টেক্সাসের ইউটি সাউথওয়েস্টার্ন মেডিকেল সেন্টারের মিখালিস আগাথোক্লিয়াস ২০১৭ সালে এ বিষয়ে ভাবতে শুরু করেন, যখন তার দল আবিষ্কার করে যে ভিটামিন সি রক্ত তৈরির স্টেম সেলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। যদি GULO হারানো সত্যিই নিরপেক্ষ হয়, তাহলে কেন অনেক প্রাণী (যাদের খাদ্যে প্রচুর ভিটামিন সি থাকে) তাদের এখনো এই এনজাইম কাজ করছে?

কমপক্ষে একটি অতিরিক্ত সুবিধা থাকতে হবে। যেসব প্রাণীর GULO কাজ করে, তাদের রক্তে ভিটামিন সি-এর মাত্রা স্থির থাকে; কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে তা ওঠানামা করে এবং কয়েকদিন না খেলে খুব কমে যেতে পারে। কিন্তু যদি ভিটামিন সি তৈরি করার ক্ষমতার সুবিধা থাকে, তাহলে কিছু প্রাণী কেন তা হারিয়ে ফেলবে? বিবর্তনীয় দৃষ্টিকোণ থেকে, কোনো উপকারী বৈশিষ্ট্য হারানোর সাধারণ ব্যাখ্যা হলো, হারানো ফলে রোগ বা পরজীবীর বিরুদ্ধে সুরক্ষা দেয়া।

এরপর আগাথোক্লিয়াসের সহকর্মীরা আবিষ্কার করেন যে *schistosomes* নামের এক ধরনের চ্যাপ্টা কৃমি (flatworm) অতিরিক্ত ভিটামিন সি পেলে আরও বেশি ডিম পাড়ে। এই মিঠা পানির পরজীবীরা ত্বক ভেদ করে শরীরে প্রবেশ করে এবং ভেতরে বেড়ে ওঠে। Schistosomiasis নামে পরিচিত এই রোগের অনেক উপসর্গই আসে পূর্ণবয়স্ক কৃমির ডিমে শরীরের প্রতিরোধ প্রতিক্রিয়া থেকে।

ভিটামিন সি-এর অভাব কী পরজীবীর বিরুদ্ধে সুরক্ষা দিতে পারে তা দেখতে, আগাথোক্লিয়াস ও তার দল কিছু ইঁদুরের GULO জিন মুছে দেয়। কম ভিটামিন সি-যুক্ত খাদ্য খাওয়ানো হলে, সংক্রমণের পর এই ইঁদুরগুলো কোনো উপসর্গ দেখায়নি এবং মলদ্বার দিয়ে ডিম নির্গত করেনি। বিপরীতে, যেসব ইঁদুরের GULO এনজাইম সক্রিয় ছিল তারা প্রচুর ডিম ছেড়েছে এবং অধিকাংশই মারা গেছে।

"আমরা প্রমাণ দিয়েছি যে এর একটি সুবিধা রয়েছে," বলেন আগাথোক্লিয়াস। তিনি জানান, আমাদের পূর্বপুরুষদের GULO হারানো রোগ প্রতিরোধের জন্য প্রাকৃতিকভাবে নির্বাচিত হয়েছিল তা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করার উপায় নেই, তবে গবেষণাটি অন্তত এটিকে সম্ভাব্য করে তোলে।

ভার্জিনিয়া টেক-এর ডেবোরাহ গুড, যিনি এই গবেষণায় জড়িত ছিলেন না, বলেন, "যদিও অনেক পাঠ্যপুস্তকে এটিকে 'ব্যবহার করো অথবা হারিয়ে ফেলো' ধরনের পরিস্থিতি বলা হয়, আমি সহ অনেক বিজ্ঞানী বিশ্বাস করি যে এই জিন হারানোর পেছনে বিবর্তনীয় সুবিধার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। পরজীবী থেকে সুরক্ষা তার একটি হতে পারে।"

লেখক: ফাইজাহ্ সুলতানা

রেফারেন্স: DOI: 10.1101/2025.07.22.666193

জীবাশ্ম বিজ্ঞান

প্রথম মানব প্রজাতি কী ছিল?

Homo rudolfensis (বামে) এবং Homo habilis (ডানে) এর খুলি। উভয়ই Homo গণের প্রাথমিক প্রজাতি (The Natural History Museum/Alamy)

আজকের দিনে পৃথিবীর সব মানুষই আধুনিক মানব প্রজাতি হোমো স্যাপিয়েন্স (*Homo sapiens*)-এর সদস্য যার লাতিন অর্থ হলো "জ্ঞানী মানুষ।" কিন্তু আমরা ইতিহাসে বিদ্যমান একমাত্র মানুষ নই। জীবাশ্ম গবেষণা ক্রমে প্রকাশ করছে আরও অনেক প্রাচীন মানুষের গল্প যার মাধ্যে রয়েছে হোমো ইরেক্টাস (*Homo erectus*) {লাতিনে অর্থ "সোজা হয়ে দাঁড়ানো মানুষ"}, যারা আফ্রিকা, এশিয়া এবং ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে আজ থেকর প্রায় ১৯ লক্ষ বছর আগে থেকে ১ লক্ষ ১০ হাজার বছর আগ পর্যন্ত বসবাস করত।

এখন বিজ্ঞানীরা হোমো (*Homo*) গণে এক ডজনেরও বেশি প্রজাতিকে শনাক্ত করেছেন। তাহলে প্রশ্ন হলো, প্রথম মানব প্রজাতি কোনটি ছিল? উত্তরটা অবশ্য বিজ্ঞানীদের কাছে একেবারেই পরিষ্কার নয়।

মরক্কোতে আবিষ্কৃত ফসিল দেখিয়েছে, শারীরিকভাবে আধুনিক মানুষ অন্তত ৩ লক্ষ বছর আগেই উদ্ভূত হয়েছিল। তবে সবচেয়ে পুরনো যে মানব প্রজাতিকে বিজ্ঞানীরা নিশ্চিতভাবে চেনেন, তার নাম হোমো হাবিলিস (*Homo habilis*), যার অর্থ "হাতের কাজে দক্ষ মানুষ।" এরা ছিল এমন এক প্রাইমেট যারা হাতিয়ার ব্যবহার করত, সোজা হয়ে হাঁটত, আর আফ্রিকায় আজ থেকে ২৪ লক্ষ বছর আগে থেকে ১৪ লক্ষ বছর আগে পর্যন্ত বাস করত।

"শারীরিকভাবে আধুনিক মানুষ অন্তত ৩ লক্ষ বছর আগেই উদ্ভূত হয়েছিল"

তবে আরও প্রাচীন কিছু জীবাশ্ম ইঙ্গিত দেয় যে হোমো হাবিলিসের আগেও অন্য হোমো প্রজাতি থাকতে পারে। কিন্তু সমস্যা হলো, প্রাচীন মানুষের জীবাশ্ম অত্যন্ত বিরল। এতে বোঝা মুশকিল, কোনো অস্বাভাবিক জীবাশ্ম নতুন কোনো প্রজাতি কিনা, নাকি পরিচিত প্রজাতিরই অদ্ভুত কোনো উদাহরণ। তার ওপর, বিবর্তন অনেক ধীরে ধীরে ঘটে, তাই নির্দিষ্টভাবে বলা কঠিন কখন একেবারে নতুন প্রজাতির উদ্ভব ঘটেছে, বিশেষত তখন যখন কোনো জীবাশ্মে একাধিক প্রজাতির বৈশিষ্ট্য একসাথে দেখা যায়। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবাশ্মবিজ্ঞানী টিম ডি. হোয়াইট বলেন, "বিবর্তনের প্রক্রিয়া অবিরাম, কিন্তু আমরা সুবিধার জন্য যে নাম বা লেবেল দিই, তা স্থির থাকে।

প্রাচীনতম হোমো

বেশিরভাগ বিবর্তন তত্ত্ব অনুযায়ী, হোমো হাবিলিস এসেছে আরও প্রাচীন এক প্রাইমেট গণ থেকে, যার নাম অস্ট্রালোপিথেকাস (*Australopithecus*)। লাতিন ভাষায় এর অর্থ "দক্ষিণের বনমানুষ," কারণ এর প্রথম জীবাশ্ম দক্ষিণ আফ্রিকায় আবিষ্কৃত হয়েছিল।

বিভিন্ন প্রজাতির অস্ট্রালোপিথেকাস আজ থেকে প্রায় ৪৪ লক্ষ বছর আগে থেকে ১৪ লক্ষ বছর আগ পর্যন্ত বেঁচে ছিল। সম্ভবত হোমো হাবিলিস সরাসরি এসেছে অস্ট্রালোপিথেকাস আফারেনসিস (*Australopithecus afarensis*) থেকে যার সবচেয়ে বিখ্যাত উদাহরণ হলো "লুসি", ১৯৭৪ সালে ইথিওপিয়ার হাদার অঞ্চলে খুঁজে পাওয়া এক কঙ্কাল।

আমাদের হোমো গণের জীবাশ্ম সাধারণত আলাদা করা যায় ছোট দাঁত ও তুলনামূলকভাবে বড় মস্তিষ্ক দ্বারা। এ কারণেই হোমো প্রজাতি বেশি করে পাথরের হাতিয়ার ব্যবহার করতে পেরেছিল। কিন্তু হোয়াইটের মতে, ছোট দাঁত আর বড় মস্তিষ্কের মতো বৈশিষ্ট্য অস্ট্রালোপিথেকাসের জনসংখ্যার মধ্যেই ধীরে ধীরে বিকশিত হচ্ছিল, যেখান থেকে পরবর্তীতে প্রাথমিক হোমো গড়ে ওঠে।

তিনি মজা করে বলেন, "যদি একজন অস্ট্রালোপিথেকাস নারী সন্তান জন্ম দিতেন, সেই শিশুকে সাথে সাথেই 'হোমো' বলে নামকরণ করা হতো না।"

ফলে, হোমোর উদ্ভবের কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই। বরং হোয়াইটের মতে, প্রায় ২০ লক্ষ থেকে ৩০ লক্ষ বছর আগে ধীরে ধীরে হোমো গণের আবির্ভাব ঘটে।

আফ্রিকায় বিবর্তন

১৯৭০-এর দশক থেকে আফ্রিকার গবেষকরা হোমো রুডলফেনসিস (Homo rudolfensis) নামে আরেকটি প্রাচীন মানব প্রজাতির জীবাশ্ম খুঁজে পেয়েছেন, যা "হোমো হাবিলিসই প্রথম হোমো" এই ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করেছে। হোমো রুডলফেনসিস শারীরিকভাবে অনেক বড় ছিল। তাদেরর মস্তিষ্ক বড় এবং মুখের গঠন ছিল সমতল যার ফলে তাদেরকে আধুনিক মানুষের মতো দেখাত।

এই জীবাশ্মগুলোর বয়সও হোমো হাবিলিসের সমসাময়িক অর্থাৎ প্রায় ২৪ লক্ষ বছর। তবে সমস্যা হলো স্মিথসোনিয়ান মিউজিয়াম অব ন্যাচারাল হিস্টোরি-এর তথ্যমতে, এই প্রজাতির মাত্র একটি ভালো মানের জীবাশ্ম পাওয়া গেছে। তাই বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত নন, এটি আসলেই আলাদা প্রজাতি কিনা, নাকি হোমো হাবিলিসেরই অস্বাভাবিক একটি রূপ, কিংবা বড় মস্তিষ্কওয়ালা কোনো অস্ট্রালোপিথেকাস।

স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউশনের হিউম্যান অরিজিনস প্রোগ্রামের প্রধান রিক পটস এর মতে, আফ্রিকার আরও পুরনো কিছু জীবাশ্ম হোমো গণের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে হচ্ছে, এবং এগুলো হয়তো হাবিলিস ও রুডলফেনসিসেরও আগে এসেছে।

সবচেয়ে পুরনো জীবাশ্মগুলোর বয়স প্রায় ২৮ লক্ষ বছর। তবে এগুলো কেবল কয়েকটি চোয়ালের হাড় ও দাঁত যা দিয়ে নিশ্চিতভাবে বলা যায় না এগুলো নতুন কোনো নামহীন হোমো প্রজাতি কিনা। তিনি আরও জানান, ২০২৫ সালের এক গবেষণায় কিছু নতুন দাঁতের জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হয়েছে, যেগুলোর বয়স ২৫.৯ লক্ষ থেকে ২৭.৮ লক্ষ বছর। এগুলোও হয়তো সেই অজানা প্রাচীন হোমো প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত।

তো শেষ পর্যন্ত বলা যায় প্রথম মানব প্রজাতি হয়তো এখনো আবিষ্কৃতই হয়নি। রিক পটস বলেন, "এ নিয়ে প্রচণ্ড উত্তেজনা আছে, তবে একইসাথে প্রচুর অনিশ্চয়তাও রয়েছে। কারণ হোমো গণের উৎপত্তি সম্পর্কে আমরা এখনো অনেক কিছু জানি না।"

লেখক: তানভীর রানা রাব্বি

রসায়ন

নতুন কার্বন অণু তৈরি করলেন বিজ্ঞানীরা

বিজ্ঞানীরা ৩৫ বছর পর প্রথমবারের মতো কক্ষ তাপমাত্রায় নতুন ধরনের সাইক্লিক কার্বন অণু সফলভাবে স্থিতিশীল করে বিশ্লেষণ করেছেন। সাধারণত এই ধরনের অণু স্থিতিশীল রাখতে এক্সট্রিম পরিবেশের প্রয়োজন হয়।

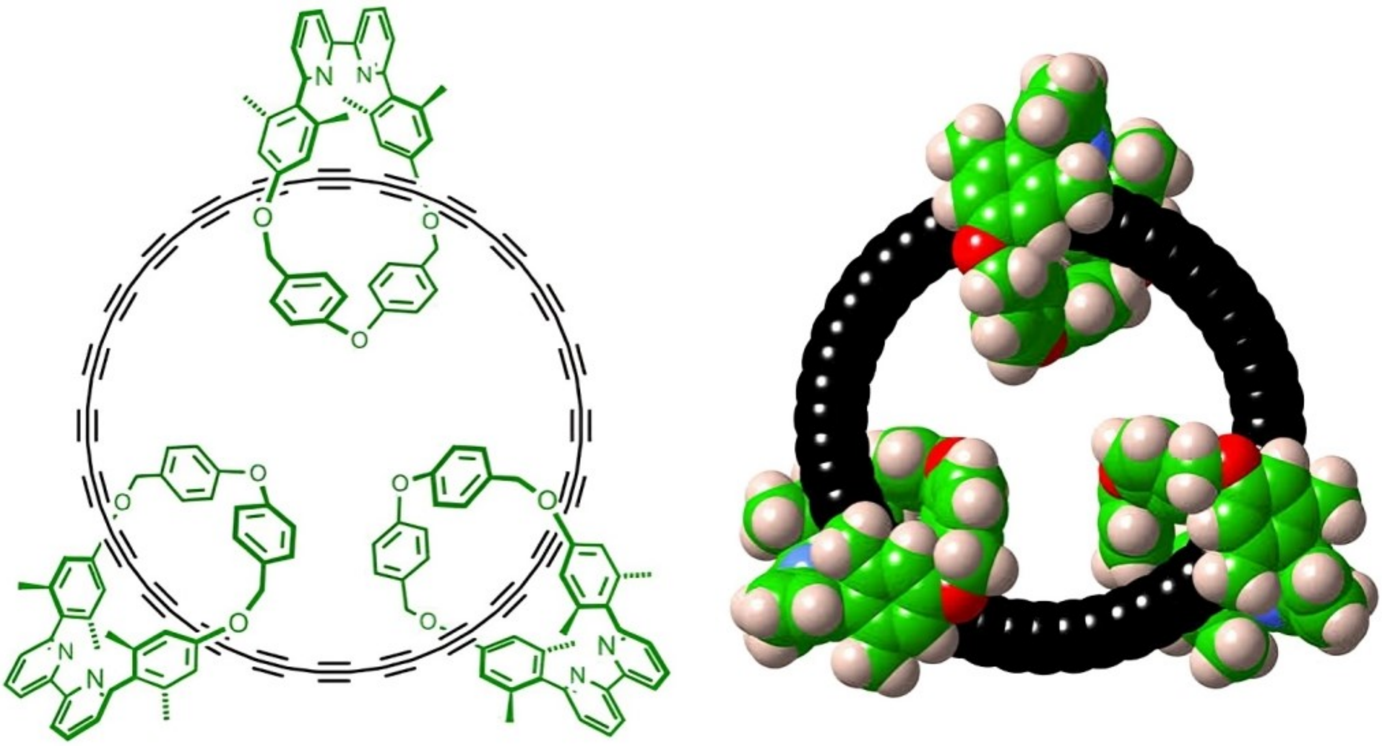

সাইক্লো[৪৮]কার্বন [৪]ক্যাটেনেন এর রাসায়নিক গঠন (বামে) এবং স্থান-পূর্ণ রিপ্রেজেন্টেশন (ডানে) [Harry Anderson]

এক নতুন ধরনের সম্পূর্ণ কার্বন অণু স্বাভাবিক কক্ষ তাপমাত্রায় স্টাডি করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত দ্বিতীয়বারের মতো এমন ঘটল ঘটল। এর আগে ৩৫ বছর আগে গোলাকার "বাকি বল" (buckyballs) তৈরি হয়েছিল। এই সাফল্য ভবিষ্যতে নতুন ইলেকট্রনিক ও কোয়ান্টাম প্রযুক্তির জন্য অত্যন্ত কার্যকর উপকরণ তৈরির পথ খুলে দিতে পারে।

সাইক্লিক কার্বন হলো এমন অণু যা কেবল কার্বন পরমাণুর একটি রিং (চক্র) দিয়ে গঠিত। এগুলো অদ্ভুত রাসায়নিক আচরণ দেখাতে পারে বা অস্বাভাবিকভাবে বিদ্যুৎ পরিবাহন করতে পারে। কিন্তু এই রিং-আকৃতির অণুগুলো এতটাই ভঙ্গুর যে সাধারণত দ্রুত ভেঙে যায়, কখনও কখনও গবেষকরা সেগুলো বিশ্লেষণ করার আগেই বিস্ফোরিতও হয়ে যায়।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের হ্যারি অ্যান্ডারসন বলেন, "সাইক্লিক কার্বন খুবই আকর্ষণীয় অণু, এবং আমরা অনেকদিন ধরেই এগুলো তৈরি করার চেষ্টা করছি।"

এতদিন এগুলো অধ্যয়নের জন্য অত্যন্ত কঠিন পরিবেশের প্রয়োজন হতো। কিন্তু অ্যান্ডারসন ও তার সহকর্মীরা কক্ষ তাপমাত্রাতেই সাইক্লিক কার্বন স্থিতিশীল রাখার উপায় খুঁজে পেয়েছেন।

তাদের পদ্ধতিতে সাইক্লিক কার্বনকে বিশেষভাবে পরিবর্তন করা হয়। তারা এই প্রযুক্তি প্রথম প্রয়োগ করেন আগে কখনও গবেষণা না হওয়া এক অণুর ওপর। তারা ৪৮টি কার্বন পরমাণুর একটি রিং, যার নাম সাইক্লো[৪৮]কার্বন বা C_{48} নিয়ে কাজ করেন। অ্যান্ডারসন ও তার দল C_{48}-এর চারপাশে "বাম্পার" লাগিয়ে, সেটিকে তিনটি ছোট রিংয়ের ভেতর

দিয়ে পেঁচিয়ে দেন, যাতে ওই ৪৮টি পরমাণু একে অপরের সাথে বা অন্য অণুর সাথে ধাক্কা না খায়।

“এখানে কোনো অপ্রয়োজনীয় অলংকরণ নেই। এখানে একদম নিখাদ সরলতার মধ্যে অসাধারণ সৌন্দর্য আছে।” বলেন জার্মানির উল্ম বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাক্স ফন ডেলিয়াস।

সাইক্লো[৪৮]কার্বন [৪]ক্যাটেনেন (cyclo[48]carbon [4]catenane) নামে নতুন এই কাঠামো প্রায় দুই দিন পর্যন্ত স্থিতিশীল থাকতে পারে, যা গবেষকদের প্রথমবারের মতো সাইক্লো[৪৮]কার্বন-কে বিস্তারিতভাবে পরীক্ষা করার সুযোগ দেয়। অবাক করা বিষয় হলো, এই ৪৮টি কার্বন এমন আচরণ করে যেন তারা এক অসীম শৃঙ্খলে সাজানো, যা তাত্ত্বিকভাবে এক পরমাণু থেকে আরেক পরমাণুতে অনির্দিষ্টকাল ধরে বৈদ্যুতিক চার্জ স্থানান্তর করতে পারে।

এই সম্ভাব্য বিদ্যুৎ পরিবাহী ক্ষমতা ইঙ্গিত দেয় যে সাইক্লিক কার্বন ভবিষ্যতের উন্নত প্রযুক্তি (যেমন ট্রানজিস্টর, সোলার সেল, সেমিকন্ডাক্টর ও কোয়ান্টাম ডিভাইস) ব্যবহারযোগ্য হতে পারে। তবে, এটি নিশ্চিত করতে আরও গবেষণা প্রয়োজন।

সাইক্লিক কার্বন স্থিতিশীল রাখার এই নতুন প্রযুক্তি হয়তো অন্যান্য গবেষকদেরও নিজেদের অনন্য কার্বন অণু নিয়ে কাজ করার অনুপ্রেরণা দেবে। ফন ডেলিয়াস বলেন, “আমার মনে হয় এখন হয়তো একধরনের দৌড় শুরু হবে। ভাবুন তো, এই দীর্ঘ রিংটাই যেন এক অসীম শৃঙ্খলা তৈরির প্রথম ধাপ।”

একক কার্বন পরমাণুর অসীম শৃঙ্খল, ফন ডেলিয়াস ব্যাখ্যা করেন, C_{48}-এর মতো রিংয়ের চেয়েও ভালো পরিবাহী হবে। “এটা হবে সত্যিই অসাধারণ—এবং সত্যিই পরবর্তী বড় পদক্ষেপ,” তিনি বলেন।

লেখক: সায়মা ইয়ানা

রেফারেন্স: *DOI: [10.1126/science.ady6054](https://doi.org/10.1126/science.ady6054)*

জেনেটিক্স

প্রথমবারের মতো মিষ্টি আলুর জিনোম রহস্য উন্মোচন

বিজ্ঞানীরা প্রথমবারের মতো মিষ্টি আলুর একটি জাতের সম্পূর্ণ ও সঠিকভাবে আলাদা করা জিনোম উন্মোচন করেছেন। এর ছয় সেট ক্রোমোসোম ও জটিল জিনগত গঠন মিষ্টি আলুকে অভিযোজন ও রোগ প্রতিরোধে অসাধারণ ক্ষমতা দিয়েছে। ভবিষ্যতে অন্যান্য জাতের জিনোম উন্মোচন করে আরও মূল্যবান জিন আবিষ্কারের সম্ভাবনা রয়েছে।

Benard Yada/National Crops Resources Research Institute in Uganda

বিশ্বব্যাপী খাদ্য নিরাপত্তার জন্য মিষ্টি আলু একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রধান খাদ্যশস্য, যা কোটি মানুষের পেটে খাবার জোগায়। বিশেষ করে সাব-সাহারান আফ্রিকায়, জলবায়ুর চরম পরিবর্তন সহ্য করার স্বাভাবিক ক্ষমতার কারণে এই ফসলটি অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। তবে বহু দশক ধরে এই সাধারণ মূলাজাতীয় সবজি তার জিনগত রহস্য গোপন রেখেছিল।

মিষ্টি আলুর ডিএনএ অত্যন্ত জটিল। যেখানে মানুষের দুই সেট ক্রোমোসোম (প্রত্যেকটি বাবা-মায়ের কাছ থেকে একটি করে), সেখানে মিষ্টি আলুর আছে ছয় সেট ক্রোমোসোম। এই অবস্থাকে হেক্সাপ্লয়েডি বলা হয়। হেক্সাপ্লয়েডির জিনগত কোড ডিকোড করাকে এমন এক জটিল কাজে পরিণত করেছে, যেন ছয়টি আলাদা কিন্তু মিল আছে এমন বিশ্বকোষের সেট একসাথে মিশিয়ে ফেলা হয়েছে এবং সেগুলো আবার আলাদা করে সাজাতে হবে।

আধুনিক ডিএনএ সিকোয়েন্সিং ও অন্যান্য উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে, বয়েস থম্পসন ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ঝাংজুন ফেই ও তার সহকর্মীরা প্রথমবারের মতো 'তানজানিয়া' নামের একটি মিষ্টি আলুর জাতের সম্পূর্ণ জিনোম উন্মোচন করেছেন। আফ্রিকায় এই জাত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ও উচ্চ শুষ্ক পরিবেশ সহ্য করার ক্ষমতার জন্য বিশেষভাবে সমাদৃত।

মূল চ্যালেঞ্জ ছিল উদ্ভিদের ৯০টি ক্রোমোসোমকে ছয়টি অরিজিনাল সেটে ভাগ করা, যাকে হ্যাপলোটাইপ বলা হয়। গবেষকরা সম্পূর্ণভাবে এই জটিল জিনোমকে আলাদা বা ফেজ করতে সক্ষম হয়েছেন, যা আগে কখনও হয়নি।

অধ্যাপক ফেই বলেন, "সম্পূর্ণ, ফেজ করা জিনোম আমাদের এক অভূতপূর্ব স্বচ্ছতা দিয়েছে। আমরা এখন মিষ্টি আলুর জিনগত গল্প বিস্তারিতভাবে পড়তে পারি।"

দলটির মতে, মিষ্টি আলুর জিনোম আসলে একাধিক বন্য পূর্বপুরুষ থেকে তৈরি এক ধরনের মোজাইক, যার কিছু এখনও অজানা। প্রায় এক-তৃতীয়াংশ এসেছে *Ipomoea aequatoriensis* নামের এক বন্য প্রজাতি থেকে, যা ইকুয়েডরে পাওয়া যায় এবং সম্ভবত মিষ্টি আলুর সরাসরি পূর্বপুরুষ। আরেকটি বড় অংশ *Ipomoea batatas* 4x নামের মধ্য আমেরিকার এক বন্য প্রজাতি থেকে এসেছে, যদিও প্রকৃত উৎস হয়তো এখনও বন্য পরিবেশে অজানা রয়ে গেছে।

বয়েস থম্পসন ইনস্টিটিউটের ড. শান উ বলেন, "গমের ক্ষেত্রে আমরা পূর্বপুরুষদের অবদান আলাদা জিনোম সেকশনে পাই। কিন্তু মিষ্টি আলুতে, পূর্বপুরুষদের সিকোয়েন্স একই ক্রোমোসোমে জটিলভাবে মিশে আছে, যা একেবারেই অনন্য জিনোমিক গঠন তৈরি করেছে।"

এই জটিল জিনগত হেরিটেজ মিষ্টি আলুকে সেগমেন্টাল অ্যালোপলিপ্লয়েড হিসেবে প্রাথমিকভাবে শ্রেণিবদ্ধ করে, অর্থাৎ এটি ভিন্ন প্রজাতি থেকে উদ্ভূত এক ধরনের সংকর, কিন্তু জিনগতভাবে এক প্রজাতির মতো আচরণ করে। এই জিনোমের মিশ্রণ ও পুনর্গঠন মিষ্টি আলুকে অসাধারণ অভিযোজন ক্ষমতা ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দিয়েছে, যা বিশ্বজুড়ে ক্ষুদ্র কৃষকদের জন্য অপরিহার্য।

অধ্যাপক ফেই আরও বলেন, "মিষ্টি আলুর ছয় সেট ক্রোমোসোম তার টিকে থাকার ক্ষমতাকে বাড়িয়ে দিয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ জিনের একাধিক কপি থাকায় গাছটি খরা সহ্য করতে, পোকামাকড় প্রতিরোধ করতে এবং নানা পরিবেশে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম হয়, যা পলিপ্লয়েড বাফারিং নামে পরিচিত।"

তবে তিনি সতর্ক করে বলেন, "মিষ্টি আলুর পূর্ণ জিনগত সম্ভাবনা বুঝতে হলে, বিভিন্ন অঞ্চলের একাধিক জাতের জিনোম উন্মোচন করতে হবে, কারণ প্রতিটি জাতের মধ্যে এমন অনন্য জিন থাকতে পারে যা অন্যদের মধ্যে হারিয়ে গেছে।"

লেখক: নোশীন নওর জামান

রেফারেন্স: DOI: 10.1038/s41477-025-02079-6

জিনোম

Pol Fernandez/Getty Images

একটি জিনোম (Genome) হলো কোনো জীবের সম্পূর্ণ জেনেটিক নির্দেশাবলীর সেট।

বেশিরভাগ জীবের ক্ষেত্রে, এই জেনেটিক নির্দেশনা থাকে ডিএনএ (DNA) আকারে। ডিএনএ অণুর মধ্যে জীব গঠনের এবং টিকে থাকার নির্দেশনা সঞ্চিত থাকে। অধিকাংশ জীবের ডিএনএ সংগঠিত থাকে ক্রোমোজোমে। একটি ক্রোমোজোমের কিছু অংশ হলো জিন (gene)। জিন হলো ডিএনএ-র ছোট ছোট অংশ, যা কোনো জীবের প্রোটিন (এবং আরও কিছু অণু) তৈরির নির্দেশ বহন করে।

তবে, জিন কোনো জীবের পুরো জিনোমের কেবল একটি ক্ষুদ্র অংশ। জিনোমের অধিকাংশই গঠিত নন-কোডিং ডিএনএ (non-coding DNA) দিয়ে। এই অংশে জিন থাকে না। বিজ্ঞানীরা একসময় একে "জাঙ্ক ডিএনএ" বলতেন, কারণ মনে করা হতো এর কোনো কাজ নেই। কিন্তু পরে দেখা গেছে, নন-কোডিং ডিএনএ বিভিন্নভাবে জীবকে সাহায্য করে—যেমন কোষকে জিনের কোড ব্যবহার করতে ও পড়তে সক্ষম করে।

"পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জিনোম নিউ ক্যালেডোনিয়ান ফার্নের।"

মানবদেহের অধিকাংশ কোষে থাকে একটি পূর্ণ জিনোম—৪৬টি ক্রোমোজোম, যা সাজানো থাকে ২৩ জোড়ায়। তবে ব্যতিক্রমও আছে। যেমন, পূর্ণবয়স্ক লাল রক্তকণিকাতে কোনো ডিএনএ-ই থাকে না। আবার ডিম্বাণু এবং শুক্রাণুতেও পূর্ণ জিনোম থাকে না। এরা বহন করে অর্ধেক জিনোম—মানুষের ক্ষেত্রে সেটি হলো ২৩টি ক্রোমোজোম। ডিম্বাণু ও শুক্রাণু মিলিত হলে তৈরি হয় একটি নতুন কোষ, যাতে পূর্ণ ৪৬টি ক্রোমোজোম থাকে। একটি মানব জিনোমে থাকে প্রায় ২৫,০০০ জিন এবং অসংখ্য নন-কোডিং অঞ্চল।

কিছু ভাইরাস ডিএনএ নয়, বরং আরএনএ (RNA) ব্যবহার করে তাদের জেনেটিক উপাদান হিসেবে। ভাইরাস আসলে জীবিত নয় কোষের মতো, তবুও তাদের সম্পূর্ণ আরএনএ নির্দেশনাকেও আমরা জিনোম বলি।

ডিএনএ ও আরএনএ দুটোই গঠিত হয় নিউক্লিওটাইড (nucleotide) নামক একক দিয়ে। এগুলোকে প্রকাশ করা হয় A, T, G এবং C অক্ষর দিয়ে (আরএনএ-তে T-এর জায়গায় U থাকে)। ডিএনএ-র নিউক্লিওটাইডগুলো যুগল আকারে থাকে, যাকে বলা হয় বেস পেয়ার (base pair)। একটি মানব জিনোমে থাকে প্রায় ৩ বিলিয়ন বেস পেয়ার। এই বেস পেয়ারের বিভিন্ন সমন্বয়ই জীব তৈরির পূর্ণ নির্দেশনা বহন করে।

প্রজাতিভেদে জিনোমের আকার ভিন্ন হয়। যেমন, জাপানি উদ্ভিদ *Paris japonica*-র জিনোম মানুষের তুলনায় প্রায় ৫০ গুণ বড়। এটির সম্পূর্ণ ডিএনএ-তে থাকে প্রায় ১৪৯ বিলিয়ন বেস পেয়ার। এক কোষের ডিএনএ যদি টেনে ছড়িয়ে দেওয়া হয়, তবে সেটি প্রায় ১০০ মিটার (৩৩০ ফুট) লম্বা হবে। তুলনায়, মানুষের জিনোম ছড়িয়ে দিলে হবে মাত্র ২ মিটার (৬.৫ ফুট)।

অন্যদিকে, এককোষী সবুজ শৈবাল *Ostreococcus tauri*-এর জিনোম খুব ছোট। এতে আছে মাত্র ১২.৬ মিলিয়ন বেস পেয়ার। এর ডিএনএ টেনে ছড়ালে দৈর্ঘ্য হবে মাত্র ৮ মিলিমিটার (০.৩ ইঞ্চি)।

মজার ব্যাপার হলো, কমলা রঙের বিড়ালদের স্বতন্ত্র চেহারা আসে তাদের জিনোমে থাকা এক ধরনের ডিএনএ ডিলিশন (DNA deletion) থেকে।

লেখক: ফাইজাহ্ সুলতানা

মস্তিষ্ক

পাসওয়ার্ডে চালু হবে ‘মাইন্ড-রিডিং’!

গবেষণায় প্রথমবারের মতো ব্রেইন ইমপ্লান্টের মাধ্যমে নীরব কথোপকথন নির্ভুলভাবে ডিকোড করার পথ উন্মোচিত হয়েছে। পাসওয়ার্ডভিত্তিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবহারকারীর গোপনীয়তা রক্ষার নতুন সমাধান হিসেবে সামনে এসেছে। ভবিষ্যতে এ প্রযুক্তি বাকশক্তিহীন মানুষের জন্য বড় সহায়ক হতে পারে।

একটি বিশেষ ব্রেইন ইমপ্লান্ট মানুষের মনের ভেতরের নীরব কথোপকথন (internal chatter) ডিকোড করতে সক্ষম হয়েছে, তবে ডিভাইসটি কেবল তখনই কাজ করে যখন ব্যবহারকারী একটি নির্দিষ্ট পাসওয়ার্ড চিন্তা করে।

এই মাইন্ড-রিডিং ডিভাইস বা ব্রেইন–কম্পিউটার ইন্টারফেস (BCI) কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে মানুষের মনের ভেতরে কল্পনা করা বাক্যের প্রায় ৭৪% সঠিকভাবে বুঝতে পেরেছে। তবে এটি কেবল তখনই সক্রিয় হয়, যখন ব্যবহারকারী একটি নির্দিষ্ট কীওয়ার্ড চিন্তা করে। ফলে ব্যবহারকারীর ব্যক্তিগত চিন্তা অনিচ্ছাকৃতভাবে প্রকাশ পাওয়ার ঝুঁকি কমে যায়।

গত ১৪ আগস্ট, ২০২৫ *Cell* জার্নালে প্রকাশিত এই গবেষণাকে নিউ ইয়র্কের ফাইনস্টেইন ইনস্টিটিউট ফর মেডিকেল রিসার্চের নিউরাল ইঞ্জিনিয়ার সারাহ ওয়ান্ডেল্ট একটি “প্রযুক্তিগতভাবে চমকপ্রদ ও অর্থবহ পদক্ষেপ” বলে আখ্যা দিয়েছেন। তার মতে, পাসওয়ার্ড ব্যবহারের এই পদ্ধতি ব্যবহারকারীর গোপনীয়তা রক্ষার সহজ উপায়, যা বাস্তব জীবনে এর ব্যবহারকে আরও কার্যকর করবে।

BCI সিস্টেম মস্তিষ্কের সংকেতকে টেক্সট বা অডিওতে রূপান্তর করে এবং এটি পক্ষাঘাতগ্রস্ত বা সীমিত পেশী নিয়ন্ত্রণে ভোগা ব্যক্তিদের জন্য যোগাযোগ ফিরিয়ে দেওয়ার আশাব্যঞ্জক প্রযুক্তি। তবে ঝুঁকি রয়েছে, এটি হয়তো এমন বাক্যও ডিকোড করে ফেলতে পারে যা ব্যবহারকারী প্রকাশ করতে চাননি।

স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউরাল ইঞ্জিনিয়ার এরিন কুনজের নেতৃত্বে গবেষকরা প্রথমে চারজন অংশগ্রহণকারীর মস্তিষ্ক থেকে মাইক্রোইলেক্ট্রোডের মাধ্যমে সংকেত সংগ্রহ করেন। এদের একজন স্ট্রোকে বাকশক্তি হারিয়েছেন এবং বাকিরা মোটর নিউরন রোগে আক্রান্ত। গবেষণায় দেখা গেছে, তারা মুখে শব্দ উচ্চারণের চেষ্টা করুক বা শুধু কল্পনা করুক, দু’ক্ষেত্রেই একই মস্তিষ্ক অঞ্চল সক্রিয় হয়, তবে কল্পনার সংকেত তুলনামূলক দুর্বল।

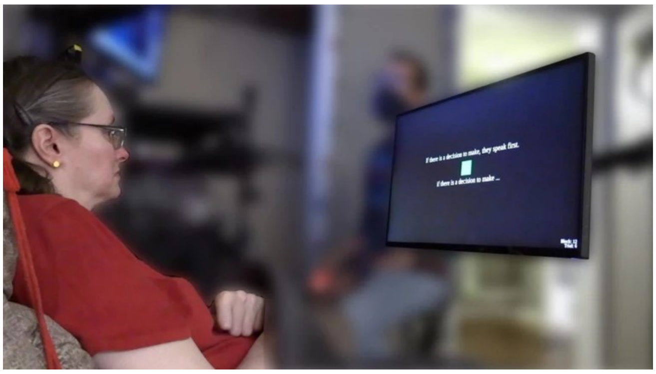

Emory BrainGate Team

এরপর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মডেলের সাহায্যে গবেষকরা এই সংকেত থেকে ফনিম (বাক্যের ক্ষুদ্রতম ধ্বনি) শনাক্ত করেন এবং সেগুলো জুড়ে বাক্য তৈরি করেন। ১,২৫,০০০ শব্দের ভাণ্ডার থেকে রিয়েল-টাইমে বাক্য গঠনের এই প্রক্রিয়ায়, দুইজন অংশগ্রহণকারীর কল্পিত বাক্যের প্রায় ৭৪% সঠিকভাবে শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। এমনকি নীরবে গণনা করার সময় সংখ্যাও শনাক্ত করেছে ডিভাইসটি।

ঝুঁকি এড়াতে সিস্টেমে একটি ‘পাসওয়ার্ড’ যোগ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, যখন অংশগ্রহণকারীরা কেবল “Chitty-Chitty-Bang-Bang” (একটি ইংরেজি শিশুতোষ নভেলের নাম) কল্পনা করলেন, তখনই সিস্টেম সক্রিয় হলো এবং এটি ৯৮% এর বেশি নির্ভুলতায় শনাক্ত করা গেল।

গবেষকরা জানিয়েছেন, ভবিষ্যতে মোটর কর্টেক্সের বাইরেও মস্তিষ্কের অন্যান্য অঞ্চলের ভাষা সংকেত পরীক্ষা করা হবে, যাতে আরও বৈচিত্র্যময় বাকশক্তি সমস্যার সমাধান করা যায়। পাশাপাশি গতি ও নির্ভুলতাও বাড়ানোর কাজ চলবে।

লেখক: সুমা ফ্রিসিয়া

রেফারেন্স: *DOI: 10.1016/j.cell.2025.06.015*

পদার্থবিজ্ঞান

একক ইলেকট্রন শনাক্তকরণে নতুন সাফল্য

বিজ্ঞানীরা একক ইলেকট্রন শনাক্ত করার এক নতুন ও অত্যন্ত দ্রুত পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন, যা মাত্র ট্রিলিয়ন ভাগের এক সেকেন্ডে কাজ করে। এই প্রযুক্তি ভবিষ্যতে একক ইলেকট্রন-ভিত্তিক সুপার-ফাস্ট ও ক্ষুদ্র ইলেকট্রনিক্স এবং কোয়ান্টাম প্রযুক্তি বিকাশে পথ দেখাতে পারে।

প্রচলিত ইলেকট্রনিক সার্কিটে অসংখ্য ইলেকট্রন থাকে, কিন্তু তাদের পারস্পরিক ইন্টার‍্যাকশন প্রায়ই দক্ষতা ও কার্যক্ষমতা কমিয়ে দেয়। তাহলে কি আমরা একক ইলেকট্রনকে এতটাই নিখুঁতভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারব, যাতে একবারে মাত্র একটি ইলেকট্রন ব্যবহার করে দ্রুত ও কার্যকর সার্কিট বানানো সম্ভব হয়? যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরি (NPL)-এর মাসায়া কাটাওকা ও তার সহকর্মীরা এই লক্ষ্য পূরণের আরও এক ধাপ কাছাকাছি পৌঁছে গেছেন, কারণ তারা ইলেকট্রন শনাক্ত করার এক অত্যন্ত সূক্ষ্ম পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন।

তারা গ্যালিয়াম আর্সেনাইড (GaAs) নামের এক ধরনের সেমিকন্ডাক্টর পাতলা স্তরে দুটি ইলেকট্রন ভিন্ন ভিন্ন বিন্দুতে প্রবেশ করান। চার্জযুক্ত এই কণাগুলো অতি দ্রুত একে অপরের দিকে অগ্রসর হয়। যখন তাদের পথ খুব কাছাকাছি চলে আসে, ইলেকট্রনের মধ্যে বৈদ্যুতিক বল তাদের আলাদা করে দেয় এবং গতিপথ বাঁকিয়ে দেয়। গবেষকেরা একটি ইলেকট্রনের গতিপথ অনুসরণ করে অন্য ইলেকট্রনের উপস্থিতি শনাক্ত করতে সক্ষম হন। তারা এই শনাক্তকরণ ঘটান মাত্র ৬ ট্রিলিয়ন ভাগের এক সেকেন্ডে, যা আগের যেকোনো ইলেকট্রন শনাক্তকরণের তুলনায় প্রায় ১০০ গুণ দ্রুত।

“আমাদের পরীক্ষাটিকে বলা যেতে পারে বিশ্বের সবচেয়ে ছোট সেন্সর (একটি ইলেকট্রন) দিয়ে বিশ্বের সবচেয়ে ছোট বস্তুকে (একটি ইলেকট্রন) সনাক্ত করা,” বলেন কাটাওকা।

গবেষক জন ফ্লেচার জানান, ইলেকট্রনের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া মাত্র কয়েক ট্রিলিয়ন ভাগের এক সেকেন্ডেই শেষ হতে পারে। এখন যেহেতু তারা এই সময়সীমায় পৌঁছাতে পেরেছেন, তাই গবেষকেরা বুঝতে পারবেন ডিভাইসের ভেতরে দুটি ইলেকট্রন আসলে কীভাবে আচরণ করে এবং সেই জ্ঞান ব্যবহার করে তৈরি করা যাবে নতুন ধরনের ইলেকট্রনিক্স।

লাটভিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিয়াচেসলাভস কাশচেয়েভস বলেন, একক দ্রুত ইলেকট্রন-ভিত্তিক নতুন প্রজন্মের ইলেকট্রনিক্স বিকাশে এই কাজটি একটি মাইলফলক হতে পারে। তিনি আরও যোগ করেন, একটি ইলেকট্রন মূলত কোয়ান্টাম কণা। এর মানে ভবিষ্যতের ডিভাইসগুলো সরাসরি এর কোয়ান্টাম বৈশিষ্ট্য কাজে লাগাতে পারবে, যেমনটি আমরা ইতিমধ্যেই কোয়ান্টাম কম্পিউটিং ও যোগাযোগে ব্যবহার করছি।

গবেষকেরা মনে করেন, একক ইলেকট্রন-ভিত্তিক ডিভাইস আলোককণা (ফোটন)-ভিত্তিক কোয়ান্টাম ডিভাইসের মতোই কিছু কাজ করতে পারবে, তবে এগুলো অনেক ছোট হবে। এমনকি এই ডিভাইসগুলোকে সহজেই চিপে একীভূত করা সম্ভব হবে বলে মনে করেন ফিনল্যান্ডের আল্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিশ্চিয়ান ফ্লিন্ডট। তার মতে, এ ধরনের শনাক্তকরণ পদ্ধতি ভবিষ্যতের সব অ্যাপ্লিকেশনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় একটি ভিত্তি।

এছাড়া, এই আবিষ্কার বিদ্যুতের প্রবাহ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানও বাড়াতে পারে বলে জানিয়েছেন জার্মানির লেইবনিজ ইউনিভার্সিটি হ্যানোভারের রলফ হাউগ। বর্তমানে বৈদ্যুতিক প্রবাহের একক নির্ধারণের যে মান ব্যবহার করা হয়, তা আরও উন্নত করা সম্ভব হতে পারে যদি ইলেকট্রন ইনজেকশনের জন্য ব্যবহৃত “ইলেকট্রন পাম্প” আরও নিখুঁত করা যায়।

লেখক: পুষ্পিতা আনোয়ার

রেফারেন্স: *DOI: 10.1103/f1gd-3p5m*

জ্যোতির্বিজ্ঞান

ইউরেনাসের নতুন চাঁদ আবিষ্কার

জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ দিয়ে ইউরেনাসকে প্রদক্ষিণ করা এক নতুন ক্ষুদ্র চাঁদ আবিষ্কৃত হয়েছে, যা বর্তমানে অস্থায়ীভাবে S/2025 U 1 নামে পরিচিত। এর ব্যাস প্রায় ১০ কিমি এবং এটি ইউরেনাসের রিংয়ের প্রান্তে অবস্থান করছে। শেকসপিয়ারের নাটকের চরিত্র থেকে নামকরণ প্রথা অনুযায়ী এর আনুষ্ঠানিক নামকরণ করা হবে ভবিষ্যতে। বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, ইউরেনাসের চারপাশে আরও অজানা চাঁদ লুকিয়ে আছে, যেগুলো ভবিষ্যতে নতুন মিশনের মাধ্যমে আবিষ্কৃত হতে পারে।

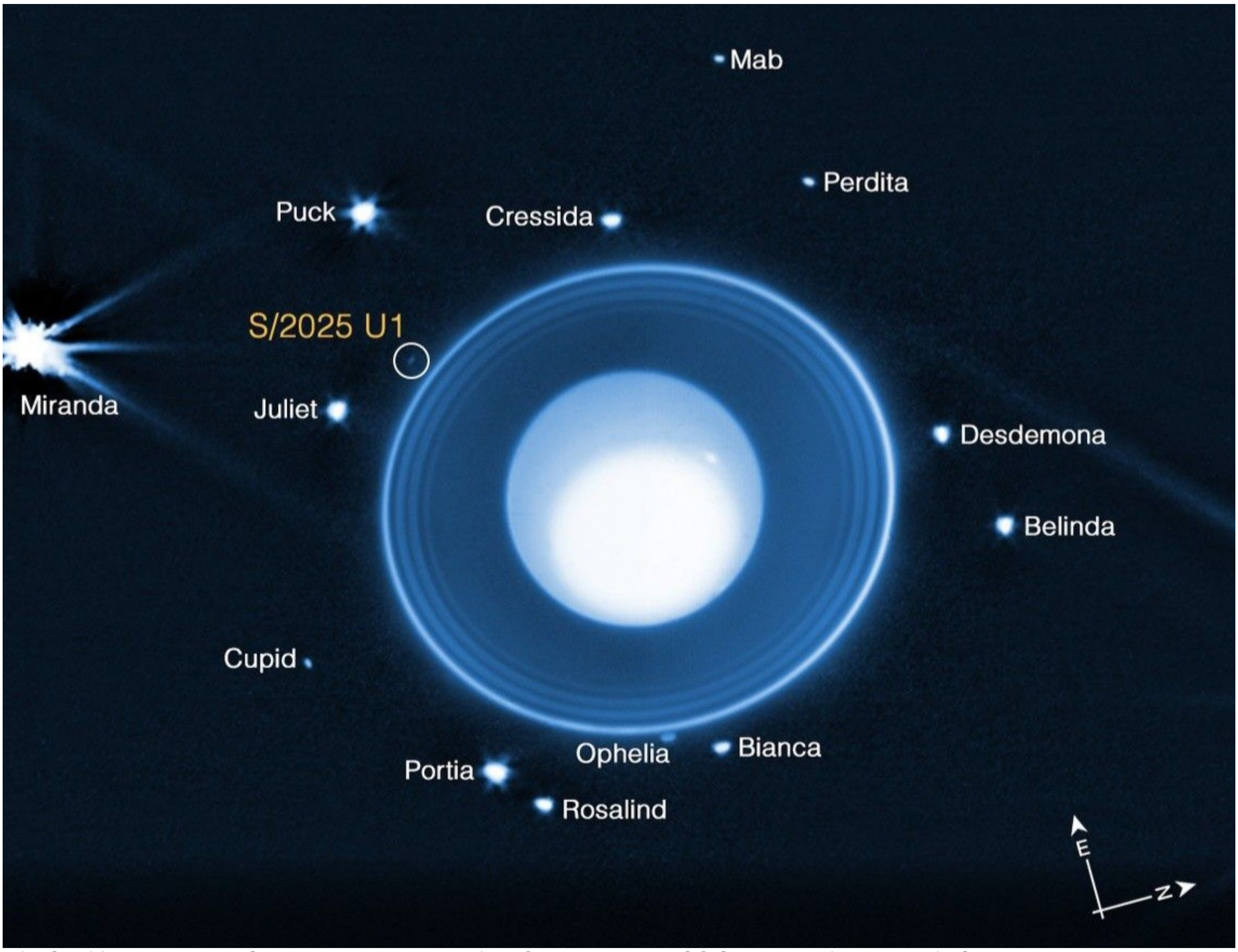

এই ছবিতে ইউরেনাসের নতুন আবিষ্কৃত চাঁদ S/2025 U1 সহ মোট ১৩টি চাঁদ দেখা যাচ্ছে। ছবিটি তিন ধরনের ডেটা একত্র করে তৈরি করা হয়েছে, যাতে গ্রহের বায়ুমণ্ডল, রিং ও চাঁদগুলো স্পষ্টভাবে দেখা যায়। ডেটা সংগ্রহে JWST-এর NIRCam-এর ইনফ্রারেড ফিল্টার ব্যবহার করা হয়েছে [NASA/ESA/CSA/STScI/M. El Moutamid (SwRI)/M. Hedman (University of Idaho)]

ইউরেনাসকে প্রদক্ষিণ করা এক ক্ষুদ্র ও ম্লান প্রাকৃতিক উপগ্রহ বা চাঁদ আবিষ্কৃত হয়েছে। এর ফলে এই গ্রহের মোট উপগ্রহের সংখ্যা দাঁড়ালো ২৯-এ। ইউরেনাসের অধিকাংশ চাঁদের নাম উইলিয়াম শেকসপিয়ারের রচনার চরিত্র থেকে নেওয়া হয়েছে, আর বিজ্ঞানীরা এখন আলোচনা করছেন নতুন চাঁদটির নাম কোন চরিত্র থেকে নেওয়া যায়।

এই নতুন চাঁদটি আবিষ্কার করেছেন সাউথওয়েস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটের মারিয়াম এল মুতামিদ নেতৃত্বাধীন এক গবেষক

দল। তারা জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ (JWST) ব্যবহার করে গত ২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ এ তোলা ১০টি লং এক্সপোজারের ইনফ্রারেড ছবি বিশ্লেষণ করে এটি খুঁজে পান।

বর্তমানে এর প্রাথমিক নাম দেওয়া হয়েছে S/2025 U 1। তবে সম্ভবত এটি শেকসপিয়ারের কোনো নাটকের চরিত্রের নামে নামকরণ করা হবে, যেমন ইউরেনাসের ২৭টি চাঁদের নামকরণ করা হয়েছে। এই নামকরণের নিয়ম শুরু হয়েছিল ইউরেনাসের প্রথম দুই চাঁদ, টাইটানিয়া ও ওবেরন, ১৭৮৭ সালে আবিষ্কারের পর থেকে।

নতুন নামটি আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করতে হবে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিয়ন (IAU) কর্তৃক, যেটি মহাজাগতিক বস্তুদের অফিসিয়াল নামকরণের দায়িত্বে থাকে। গবেষণা দলের সদস্য ও সেতি ইনস্টিটিউটের মার্ক শোয়ালটার জানিয়েছেন, নাম নিয়ে আলোচনা হয়েছে বটে, তবে এখনো কোনো শর্টলিস্ট তৈরি হয়নি।

শোয়ালটার বলেন, এত ছোট ও অন্ধকার একটি উপগ্রহ শনাক্ত করা বেশ কঠিন ছিল। তার ভাষায়, "এটা ঠিক যেন গাড়ির হেডলাইটের আলোয় তাকিয়ে একটি মাছি খুঁজে বের করার মতো।" তিনি আরও বলেন, "জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ সত্যিই এক অসাধারণ যন্ত্র, যা এর আগে তৈরি হওয়া অন্য যেকোনো টেলিস্কোপের তুলনায় বহুগুণ বেশি সংবেদনশীল।"

তিনি আশা প্রকাশ করেন যে ইউরেনাসের আরও চাঁদ আবিষ্কৃত হবে। "আমাদের কাজ এখনো শেষ হয়নি। বেশ যুক্তিসঙ্গতভাবে বলা যায়, আরও উপগ্রহ সেখানে লুকিয়ে আছে। আমরা অনেক দিন ধরেই সন্দেহ করেছি যে ইউরেনাসের রিং সিস্টেমের ভেতরে কিছু 'শেফার্ড মুন' থাকতে পারে, যেগুলো রিংয়ের কণাগুলোকে একত্রে রাখে। এখনো সেগুলো পাওয়া যায়নি, তবে আমরা বিশেষভাবে সেগুলোকেই খুঁজছি।"

এল মুতামিদ বলেন, ইউরেনাসের রিংয়ের তীক্ষ্ণ গঠনই ইঙ্গিত দিচ্ছে যে আরও অজানা চাঁদ রয়েছে, যেগুলো রিংয়ের গঠনে সাহায্য করেছে। "অবশ্যই আরও অনেক ছোট চাঁদ সেখানে আছে, শুধু আমাদের সনাক্ত করার অপেক্ষায়। হয়তো জেমস ওয়েব সেগুলো খুঁজে পাবে, তবে ২০৪৪ সালে যদি ইউরেনাস অরবিটার ও প্রোব মিশন শুরু হয়, তখন আরও অনেকগুলো একসাথে আবিষ্কৃত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এর মধ্যে অনেক চাঁদ এতটাই ছোট যে বর্তমান রেজোলিউশনের কারণে আমরা এখনো তাদের দেখতে পাচ্ছি না।"

নতুন চাঁদ S/2025 U 1-এর ব্যাস প্রায় ১০ কিলোমিটার বলে অনুমান করা হচ্ছে। এত ছোট হওয়ায় এটি ভয়েজার-২ মহাকাশযানের ক্যামেরায় ধরা পড়েনি। ১৯৭৭ সালে উৎক্ষেপিত ভয়েজার-২ ইউরেনাসের সবচেয়ে কাছে পৌঁছেছিল ১৯৮৬ সালে, মাত্র ৮০,০০০ কিলোমিটার দূরত্বে। এখন পর্যন্ত সেটিই পৃথিবী থেকে পাঠানো কোনো মহাকাশযান যা ইউরেনাসের সবচেয়ে কাছাকাছি গিয়েছে।

এই নতুন চাঁদটি ইউরেনাসের ভেতরের রিংগুলোর প্রান্তে অবস্থান করছে, গ্রহটির কেন্দ্র থেকে প্রায় ৫৬,২৫০ কিলোমিটার দূরে। এটি অবস্থান করছে অন্য দুটি চাঁদ, ওপেলিয়া ও বিয়াঙ্কার কক্ষপথের মাঝামাঝি।

নাসা জেমস ওয়েব টেলিস্কোপের জন্য একটি "General Observer" প্রোগ্রাম চালায়, যেখানে সারা বিশ্বের বিজ্ঞানীরা আবেদন করতে পারেন নির্দিষ্ট লক্ষ্যের জন্য টেলিস্কোপের উন্নত সেন্সর ব্যবহার করতে। এল মুতামিদ JWST-এর হাই রেজোলিউশনের ইনফ্রারেড সেন্সর NIRCam ব্যবহার করে ইউরেনাসের রিং গবেষণার আবেদন করেছিলেন। সেই গবেষণার ফলেই আবিষ্কৃত হলো এই নতুন ক্ষুদ্র চাঁদ।

লেখক: নুজহাত সুবাহ ঐশী

অণুজীববিজ্ঞান

চকলেটের স্বাদ নির্ধারণে অণুজীবের বড় ভূমিকা

গবেষণায় দেখা গেছে যে, চকলেটের স্বাদ নির্ধারণে ফারমেন্টেশনের সময়কার pH, তাপমাত্রা ও জীবাণুর প্রকারভেদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রক্রিয়া কৃত্রিমভাবে নিয়ন্ত্রণ করে উন্নত মানের, এমনকি নতুন ধরনের ডিজাইনার চকলেট বানানো সম্ভব হতে পারে।

Mimi Chu Leung

আমরা যখন এক টুকরো চকলেট কামড় বাসাই, তখন ভেতরে লুকানো ভিন্নধর্মী ফলের ঘ্রাণ, বাদামের মতো নরম স্বাদ আর মাটির মতো গভীর সুবাস একসাথে মিশে যায়। কিন্তু এই জটিল স্বাদ আসলে কোথা থেকে আসে? নতুন এক গবেষণা জানাচ্ছে, এর আসল রহস্য লুকিয়ে আছে কোকো বীজের ফারমেন্টেশন বা গাঁজন প্রক্রিয়ায়।

সাধারণত কোকো ফারমেন্টেশন প্রাকৃতিকভাবে ঘটে। বীজগুলো কাঠের বাক্স বা ঝুড়িতে রাখা হয় এবং পরিবেশ থেকে আসা নানা ব্যাকটেরিয়া ও ফাঙ্গাস নিজেরাই কাজ শুরু করে। এই প্রক্রিয়ার সময় অণুজীবরা বীজের ভেতরে রাসায়নিক রূপান্তর ঘটায়, যা চকলেটকে তিক্ত আর কষাভাব থেকে মুক্ত করে এনে দেয় নরম, জটিল এবং মিষ্টি স্বাদ।

গত ১৮ আগস্ট, ২০২৫ *Nature Microbiology* জার্নালে প্রকাশিত এক গবেষণায় দেখা গেছে, ফারমেন্টেশনের সময় pH, তাপমাত্রা আর উপস্থিত জীবাণু মিলেই ঠিক করে চকলেটের স্বাদ কেমন হবে। এমনকি তারা পরীক্ষাগারে কৃত্রিমভাবে আদর্শ ফারমেন্টেশনের পরিবেশ তৈরি করে উচ্চমানের চকলেটের স্বাদও পুনরুৎপাদন করতে পেরেছেন।

গবেষণার সহলেখক এবং যুক্তরাজ্যের নটিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ জেনেটিসিস্ট ডেভিড গোপলচান বলেন, এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভবিষ্যতে গ্রাহকদের জন্য নতুন নতুন অনন্য স্বাদের চকলেট তৈরি সম্ভব।

যুক্তরাষ্ট্রের নেব্রাস্কা–লিংকন বিশ্ববিদ্যালয়ের খাদ্যবিজ্ঞানী হিদার হ্যালেন-অ্যাডামস মন্তব্য করেন, “এটা নিঃসন্দেহে ‘ডিজাইনার চকলেট’ তৈরি করার জন্য বিশাল সম্ভাবনা তৈরি করছে।”

ফারমেন্টেশনের স্বাদ রহস্য

ফারমেন্টেশন হলো এমন এক ধাপ যা খাবার-দাবারের স্বাদকে বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়। যেমন ওয়াইন, চিজ বা বিয়ার বানাতে খামির কিংবা বিশেষ জীবাণু যোগ করা হয়। কিন্তু চকলেট তৈরির ক্ষেত্রে কোকো বীজগুলো শুধু ফলের খোসা থেকে বের করে একত্রে রাখা হয়, স্বাভাবিকভাবেই তা ফারমেন্ট হয়ে যায়। কোনো বিশেষ জীবাণু এখানে কৃত্রিমভাবে যোগ করা

হয় না। এজন্যই দীর্ঘদিন ধরে জানা যায়নি যে, কোন শর্ত বা কোন জীবাণু চকলেটের স্বাদকে প্রভাবিত করে।

গোপলচান বলেন, "আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো চকলেটের মান বাড়ানো।" এজন্য তাঁর দল কলম্বিয়ার সানতান্দের অঞ্চলের একটি খামার থেকে কোকো সংগ্রহ করে ফারমেন্টেশনের সময় pH আর তাপমাত্রার পরিবর্তন পরীক্ষা করেন। তারা অনুমান করেছিলেন, এই ভিন্নতা ব্যাকটেরিয়া আর ছত্রাকের কার্যকলাপ বদলে দিয়ে চকলেটের স্বাদে প্রভাব ফেলে।

এরপর দলটি সানতান্দের অঞ্চলের নমুনার সঙ্গে হুইলা ও আনতিওকিয়া অঞ্চলের কোকো তুলনা করে। ফারমেন্ট করা বীজ শুকানো, ভাজা ও গুঁড়া করে কোকো 'লিকার' তৈরি করা হয়। পেশাদার টেস্টাররা জানান, সানতান্দের ও হুইলার লিকারে পাওয়া গেছে ভাজা বাদাম, পাকা বেরি আর কফির মতো স্বাদ। তুলনায়, আনতিওকিয়ার কোকো ছিল অপেক্ষাকৃত সাদামাটা আর তেতো।

গবেষকরা দেখেছেন, তিন অঞ্চলের কোকোর জেনেটিক পটভূমি প্রায় এক, তাই স্বাদের ভিন্নতার জন্য দায়ী হলো ফারমেন্টেশনের পরিবেশ ও মাইক্রোবের পার্থক্য। উদাহরণস্বরূপ, *Torulaspora* ও *Saccharomyces* নামের ছত্রাক সূক্ষ্ম আর উন্নত মানের চকলেটের স্বাদের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত।

ডিজাইনার চকলেটের পথে

পরবর্তী ধাপে বিজ্ঞানীরা পরীক্ষাগারে কৃত্রিমভাবে জীবাণুর দল তৈরি করে কোকো বীজ ফারমেন্ট করান। তৈরি হওয়া লিকার টেস্টাররা পরীক্ষা করে নিশ্চিত করেন, এগুলোতে সানতান্দের ও হুইলার মতো উন্নতমানের স্বাদ পাওয়া গেছে।

গবেষকরা বলছেন, তাদের ফলাফল প্রমাণ করছে যে, pH, তাপমাত্রা আর জীবাণুর সম্পর্কই মূলত নির্ধারণ করে কোন অঞ্চলের চকলেট কেমন স্বাদের হবে। একইসঙ্গে শিল্প পর্যায়ে চকলেট উৎপাদনে মান ও স্বাদ নিয়ন্ত্রণের নতুন পদ্ধতিরও দিকনির্দেশনা মিলছে।

"ফারমেন্টেশন খাবার-দাবারের স্বাদকে বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়"

বোগোটার লস আন্দেস বিশ্ববিদ্যালয়ের রাসায়নিক প্রকৌশলী আন্দ্রেস ফের্নান্দো গনসালেস বারিওসের ভাষায়, "এভাবে আমরা প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারব, নির্দিষ্ট স্বাদ তৈরি করতে পারব, মান বাড়াতে পারব, আর নির্দিষ্ট পরিবেশ বা সময়ের ওপর নির্ভর করতে হবে না।" এর ফলে কোকোর অর্থমূল্যও আরও বাড়তে পারে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

লেখক: সাফিয়া তাবাসসুম রুমু

রেফারেন্স: DOI: 10.1038/s41564-025-02077-6

বাংলাদেশ

বাংলাদেশের মুরগির খামারে অ্যান্টিবায়োটিকের অতি ব্যবহারের ভয়াবহ দৃশ্য

বাংলাদেশের মুরগির খামারে প্রায় সর্বত্রই অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার হচ্ছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভুলভাবে। এতে মাংস ও ডিমে ওষুধের অবশিষ্টাংশ রয়ে যাচ্ছে এবং অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী জীবাণুর ঝুঁকি বাড়ছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রশিক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ এবং সচেতনতা ছাড়া এ সঙ্কট ঠেকানো সম্ভব নয়।

বাংলাদেশে পোল্ট্রি খাত শুধু খাদ্য সরবরাহই নয়, লাখো মানুষের জীবিকারও প্রধান ভরসা। কিন্তু বাণিজ্যিক মুরগির খামারে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের চিত্র ভয়াবহ আকার নিয়েছে। গত ১৭ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে *Scientific Reports* জার্নালে সম্প্রতি প্রকাশিত এক গবেষণায় দেখা গেছে, দেশের ৯৩ শতাংশ খামারেই মুরগি পালনের সময় অন্তত একবার অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করেছে।

২০২১ সালে ঢাকার আশপাশের ছয় জেলা ও কক্সবাজারে মোট ৩৪০টি খামারে জরিপ চালিয়ে গবেষকরা দেখেছেন, মাত্র ৩১ শতাংশ খামারি জানেন না আসলে অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধ (AMR) কী। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পশুচিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়াই ওষুধ বিক্রেতা, খাদ্য সরবরাহকারী, কিংবা খামারির নিজের সিদ্ধান্তে ওষুধ ব্যবহার হচ্ছে।

সবচেয়ে বেশি অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়া হয় মাংসের মুরগিতে। ব্রয়লার খামারের ৭৮ শতাংশ এবং সোনালি খামারের ৬৭ শতাংশ মুরগিকে নিয়মিত এ ওষুধ দেওয়া হয়। ডিমপাড়া লেয়ার খামারে এই হার তুলনামূলক কম (৪১%)। তবে সমস্যার জায়গা হলো ওষুধ ব্যবহারের ধরন। প্রায় অর্ধেক খামারি "একই সঙ্গে একাধিক অ্যান্টিবায়োটিক" ব্যবহার করেন, আবার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ খামার পুরনো বা অবশিষ্ট ওষুধ (left-over antibiotics) ব্যবহার করেন, যা আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে সরাসরি ঝুঁকিপূর্ণ।

গবেষণায় আরও দেখা গেছে, কেবল ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ নয়, খামারিরা ভাইরাসজনিত কিংবা অজানা অসুস্থতার ক্ষেত্রেও অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করেন। কেউ কেউ আবার 'যদি লাগে' ভেবে একেবারে ডে-ওল্ড চিক বা একদিন বয়সী বাচ্চা মুরগিকেও ওষুধ খাওয়ান।

সবচেয়ে চিন্তার বিষয় হলো, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) তালিকায় থাকা 'অত্যন্ত জরুরি ওষুধ' (Highest Priority Critically Important Antimicrobials) যেমন ফ্লুরোকুইনোলোন, মাক্রোলাইড এমনকি কোলিস্টিনও খামারে ব্যবহার করা হচ্ছে। এ ওষুধগুলো সাধারণত মানুষে গুরুতর সংক্রমণের চিকিৎসায় শেষ ভরসা হিসেবে রাখা হয়। খামারে নির্বিচারে প্রয়োগের ফলে এর কার্যকারিতা কমে গেলে সাধারণ মানুষের জন্য ভয়াবহ স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি হবে।

আরেকটি আশ্চর্য তথ্য হলো যাদের খামারি হিসেবে অভিজ্ঞতা বেশি (১০ বছরের বেশি) তাদের মধ্যেই ভুল ব্যবহারের প্রবণতা বেশি পাওয়া গেছে। মনে হচ্ছে দীর্ঘদিনের অভ্যাস ও 'আমরা জানি' মনোভাব তাদের সঠিক প্র্যাকটিস থেকে দূরে রাখছে। বিপরীতে লেয়ার খামারিরা তুলনামূলকভাবে সচেতন; তারা পশুচিকিৎসকের পরামর্শ বেশি নেন এবং চিকিৎসা উদ্দেশ্যে সঠিকভাবে ওষুধ ব্যবহার করেন।

গবেষক দল বলছে, বাংলাদেশে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারে আইন-কানুন থাকলেও প্রয়োগ খুবই দুর্বল। ফলে খামারিদের হাতে ওষুধ পৌঁছে যাচ্ছে সহজেই, আর সঠিক প্রশিক্ষণের অভাবে তারা তা ভুলভাবে ব্যবহার করছেন। এর ফলাফল দাঁড়াচ্ছে মুরগির মাংস ও ডিমে ওষুধের অবশিষ্টাংশ (residue), এবং অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী জীবাণুর বিস্তার। উভয় ক্ষেত্রেই সাধারণ ভোক্তাদের স্বাস্থ্যে গুরুতর প্রভাব পড়তে পারে।

গবেষকদের মতে, এখনই কঠোর পদক্ষেপ না নিলে বাংলাদেশে অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধ (AMR) ভয়াবহ আকার নিতে পারে, যার প্রভাব শুধু খামারে নয়, মানুষের জীবনেও পড়বে।

লেখক: সাদিয়া ইসলাম বর্ষা

রেফারেন্স: DOI: 10.1038/s41598-025-14108-7

জীবাশ্ম বিজ্ঞান

সাড়ে সাত কোটি বছর পুরোনো ফড়িং প্রজাতির সন্ধান

কানাডায় পাওয়া নতুন ফড়িংয়ের জীবাশ্ম শুধু এক নতুন প্রজাতি নয়, এক নতুন পরিবারকেও সংজ্ঞায়িত করেছে। এটি কীটপতঙ্গের সংরক্ষণ, বৈচিত্র্য ও ফড়িংয়ের বিবর্তন ইতিহাসে বিরল ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যোগ করেছে।

আলবার্টার ডাইনোসর প্রভিন্সিয়াল পার্কে এক চমকপ্রদ জীবাশ্ম আবিষ্কার গবেষকদের সামনে এনেছে নতুন এক প্রজাতির ফড়িংয়ের প্রমাণ। নতুন ফড়িংটির *Cordualadensa acorni*। জীবাশ্মটি আবিষ্কৃত হয় ২০২৩ সালে, ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের এক স্নাতক শিক্ষার্থীর খনন অভিযানে। এটিই কানাডায় পাওয়া প্রথম ডাইনোসর যুগের ফড়িংয়ের জীবাশ্ম।

প্রথমে পাতা-জাতীয় জীবাশ্ম খোঁজার সময় হঠাৎই পাওয়া যায় আংশিক একটি ডানা। মানুষের হাতের সমান প্রস্থের এই ডানার ফড়িংটি প্রায় ৭.৫ কোটি বছর আগে ক্রিটেশিয়াস যুগে বাস করত। সে সময়ে এটি হয়তো বাস্তুতন্ত্রের ছোট কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। এরা ছিলো শিকারি ডাইনোসরের জন্য একেবারেই উপযুক্ত খাবার।

এই আবিষ্কারের সবচেয়ে বড় তাৎপর্য হলো, ফড়িংটির জন্য সম্পূর্ণ নতুন একটি পরিবার তৈরি করতে হয়েছে, যার নাম রাখা হয়েছে কর্ডুয়ালাডেনসিডি (Cordualadensidae)। একইসঙ্গে এটি উত্তর আমেরিকায় পাওয়া বৃহত্তর ফড়িং গোষ্ঠী ক্যাভিলাবিয়াটা (Cavilabiata)-এর প্রথম সদস্য।

Cordualadensa acorni এর রিকনস্ট্রাকশন (Alex Anderson)

এ জীবাশ্ম শুধু শ্রেণিবিন্যাসেই নয়, প্রাচীন কীটপতঙ্গ সংরক্ষণ সম্পর্কেও বিরল তথ্য দিয়েছে। সাধারণত এই পার্কে উদ্ভিদ আর মেরুদণ্ডী প্রাণীর জীবাশ্মই বেশি পাওয়া যায়। কিন্তু ফড়িংটি ইমপ্রেশন ফসিল আকারে সংরক্ষিত হয়েছে যা এই অঞ্চলের কীটপতঙ্গ সংরক্ষণের নতুন ধারা নির্দেশ করে। গবেষকরা এরপর অনুসন্ধানের কৌশল বদলে আরও কীটপতঙ্গ জীবাশ্ম খুঁজে পাচ্ছেন, যা ইঙ্গিত দেয় যে লেট ক্রিটেশিয়াস যুগে কীটপতঙ্গের বৈচিত্র্য পূর্বের ধারণার চেয়ে অনেক বেশি ছিল।

ডানার গঠন থেকে ধারণা করা হচ্ছে, *Cordualadensa acorni* উড়ার সময় ভেসে থাকার জন্য অভিযোজিত ছিল। এই বৈশিষ্ট্য আজকের মাইগ্রেশন করা ফড়িংদের মধ্যেও দেখা যায় এবং সম্ভবত তাদের বিবর্তনীয় সফলতার অন্যতম রহস্য। এই একটিমাত্র আবিষ্কার ডাইনোসর প্রভিন্সিয়াল পার্কে পরিচিত কীটপতঙ্গের রেকর্ড প্রায় দ্বিগুণ করেছে এবং ফড়িংয়ের বিবর্তনের ইতিহাসে ৩ কোটি বছরের ফাঁক পূরণ করেছে।

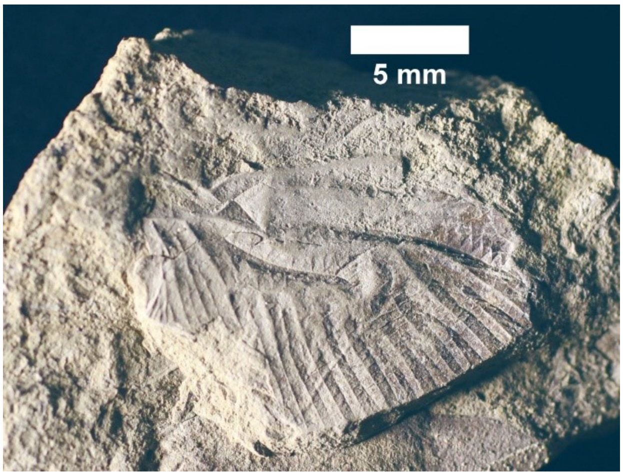

প্রাগৈতিহাসিক কানাডার জীববৈচিত্র্য বোঝার ক্ষেত্রে এই আবিষ্কারকে গবেষকেরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন। বিশ্বের সবচেয়ে সমৃদ্ধ ডাইনোসর আবাসস্থলগুলোর একটির পরিবেশগত ধাঁধায় এটি এক নতুন টুকরো প্রমাণ যোগ করেছে।

লেখক: ইসরাত জাহান

রেফারেন্স: *DOI: [10.1139/cjes-2024-0162](https://doi.org/10.1139/cjes-2024-0162)*

LIQUID3

লিকুইড ট্রি

বিশ্বব্যাপী দূষণ এখন এক ভয়াবহ সংকটে রূপ নিয়েছে। দ্রুত নগরায়ন, শিল্পায়ন এবং ক্রমবর্ধমান যানবাহনের চাপে শহরের বাতাস প্রতিনিয়ত দূষিত হচ্ছে। বিশ্বের অধিকাংশ বড় শহরেই এখন শ্বাস নেওয়ার জন্য বিশুদ্ধ বাতাস যেন একটি বিরল সম্পদে পরিণত হয়েছে। বৃক্ষ আমাদের প্রাকৃতিক অক্সিজেন সরবরাহকারী হলেও ঘনবসতিপূর্ণ শহরে যথেষ্ট পরিমাণ গাছ লাগানো প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমন এক প্রেক্ষাপটে লিকুইড ট্রি বা তরল গাছ প্রযুক্তি মানুষের সামনে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে।

লিকুইড ট্রি মূলত একটি কৃত্রিম ফটোবায়োরিয়্যাক্টর, যেখানে পানিতে শৈবাল (মাইক্রোঅ্যালগি) ভাসমান অবস্থায় রাখা হয়। এই শৈবালগুলো সূর্যের আলো কিংবা কৃত্রিম LED আলোর সাহায্যে ফটোসিনথেসিস প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে। ফলে বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাই অক্সাইড শোষিত হয় এবং অক্সিজেন উৎপন্ন হয়। গবেষণা অনুসারে, মাইক্রোঅ্যালগি গাছের তুলনায় প্রায় ১০ থেকে ৫০ গুণ বেশি দক্ষতার সঙ্গে কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণ করতে পারে।

একটি লিকুইড ট্রিতে সাধারণত ১১০ লিটার পানি থাকে, যার মধ্যে বিশেষ প্রজাতির মাইক্রোঅ্যালগি ভাসে। পুরো সিস্টেমটি পরিচালিত হয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) এবং দূরনিয়ন্ত্রিত সেন্সরের মাধ্যমে। এতে করে যন্ত্রটির কার্যক্রম স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় এবং রক্ষণাবেক্ষণও হয় তুলনামূলকভাবে সহজ। সৌরশক্তি কিংবা বিদ্যুৎ—উভয়ভাবেই এটি চালানো সম্ভব। প্রতি ৮০–১০০ দিন অন্তর শুধুমাত্র শৈবাল সংগ্রহ ও পানি রিফিল করলেই নতুন করে যন্ত্রটি আবার সক্রিয় হয়ে ওঠে।

প্রকৃত গাছ অবশ্যই পরিবেশের জন্য অপরিহার্য, তবে শহরের কংক্রিট জঙ্গলে নতুন গাছ লাগানো অনেক সময় অসম্ভব হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় মাইক্রোঅ্যালগি প্রযুক্তির বিশেষ কিছু সুবিধা রয়েছে। মাইক্রোঅ্যালগি সহজে নষ্ট হয় না এবং পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে দ্রুত মানিয়ে নিতে পারে। এগুলো উচ্চ বা নিম্ন তাপমাত্রাতেও কার্যকরভাবে টিকে থাকে এবং সাধারণত পোকামাকড় বা ভারী ধাতুর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। যেহেতু এদের জন্য মাটির প্রয়োজন নেই, তাই ছোট জায়গাতেও এগুলো ব্যবহার করা সম্ভব হয়। শহরে অবকাঠামোর সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার মতোভাবে লিকুইড ট্রিকে ডিজাইন করা হয়েছে, ফলে এটি কেবল প্রযুক্তিগতভাবে নয়, বাস্তব ক্ষেত্রেও কার্যকর সমাধান হয়ে উঠতে পারে।

লিকুইড ট্রি শহরের নানা স্থানে ব্যবহার করা যায়। পার্ক, ফুটপাত বা জনবহুল খোলা জায়গায় এটি বসানো সম্ভব। একইসঙ্গে অফিস, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা হাসপাতাল ও জিমের মতো ইনডোর জায়গাতেও এটি কার্যকর হতে পারে। এছাড়া শপিং মল, সিনেমা হল বা রেস্টুরেন্টে লিকুইড ট্রি বসিয়ে বাতাসকে পরিশুদ্ধ করা যায়। এমনকি বিমানবন্দর, রেলস্টেশন কিংবা মেট্রো স্টেশনের মতো ভিড়ভাট্টার জায়গাতেও এটি ব্যবহারযোগ্য, যেখানে প্রকৃত গাছ লাগানোর সুযোগ প্রায় নেই।

লিকুইড ট্রির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান হলো বায়ু শুদ্ধকরণ। এটি কেবল কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণ করেই থেমে থাকে না, বরং বাতাসে বিদ্যমান ভিএওসি (VOC), ধুলাবালি, ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়াও ধ্বংস করতে সক্ষম হয়। এর ফলে শহুরে পরিবেশে শ্বাস নেওয়া অনেক বেশি নিরাপদ হয়। শুধু তাই নয়, অক্সিজেনসমৃদ্ধ পরিবেশে মানুষ আরও মনোযোগী হয়ে ওঠে, মানসিক চাপ কমে এবং কর্মক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়।

শৈবাল থেকে সংগৃহীত বায়োমাসও মানুষের কাজে লাগতে পারে। এটি ব্যবহার করা যায় জৈব সার, মাছের খাবার, বায়োফুয়েল, কসমেটিকস এবং ওষুধ তৈরির কাঁচামাল হিসেবে। ফলে লিকুইড ট্রি কেবল বাতাস পরিশোধনেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং অর্থনৈতিক ও শিল্পখাতেও এর ব্যবহারিক গুরুত্ব রয়েছে।

ভবিষ্যতের জন্য এই প্রযুক্তির সম্ভাবনাও অপরিসীম। গবেষকরা মনে করেন, লিকুইড ট্রি প্রযুক্তি একদিন বর্জ্য পানির শোধন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হতে পারে। মহাকাশ গবেষণায় এটি বিশেষভাবে কার্যকর হতে পারে, যেখানে অক্সিজেন ও খাদ্য উৎপাদনের বিকল্প উপায় প্রয়োজন। একইসঙ্গে চিকিৎসাবিজ্ঞানে মূল্যবান রাসায়নিক যৌগ উৎপাদনেও এর ব্যবহার হতে পারে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) তথ্য অনুযায়ী, প্রতি বছর প্রায় ৭০ লাখ মানুষ বায়ুদূষণের কারণে মারা যায়। এর মধ্যে একটি বড় অংশ ইনডোর দূষণের শিকার। দ্রুত নগরায়ন ও শিল্পায়নের কারণে আগামী দিনে বায়ুদূষণ আরও বাড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে লিকুইড ট্রি কেবল একটি বিকল্প নয়, বরং টেকসই নগর জীবনের জন্য অপরিহার্য সমাধান হয়ে উঠতে পারে।

প্রকৃত গাছের বিকল্প কিছুই হতে পারে না—এটি সত্য। তবে যখন শহুরে পরিবেশে নতুন গাছ লাগানো প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়, তখন লিকুইড ট্রি কার্যকর সমাধান হয়ে উঠতে পারে। এটি আমাদের ভবিষ্যৎ শহরের জন্য কেবল একটি প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন নয়, বরং একধরনের টিকে থাকার কৌশল। আগামী দিনের নগর পরিকল্পনায় লিকুইড ট্রি যদি অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে একদিন হয়তো আমরা দূষণমুক্ত শহরে স্বাচ্ছন্দ্যে শ্বাস নিতে পারব।

সম্প্রতি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োরিসোর্সেস টেকনোলজি অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল বায়োটেকনোলজি ল্যাব, গবেষণা ও উদ্ভাবন কেন্দ্র (আরআইসি) এবং বাংলাদেশ সরকারের ইডিজিই প্রকল্পের সহযোগিতায় সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তি ও স্থানীয় অ্যালগি ব্যবহার করে লিকুইড ট্রি-এর একটি প্রোটোটাইপ তৈরি করা হয়েছে।

লেখক: রামিছা আলী সালওয়া

শিক্ষার্থী, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, আহসানউল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

আগস্ট মাসের সেরা বিজ্ঞানচিত্র

সূত্র: নেচার

সমুদ্রের রঙিন দৃশ্য

“আমি রুদ্রনায়া বে এলাকায় ৪০ বছরেরও বেশি সময় ধরে ডুব দিচ্ছি, কিন্তু কখনোই মটর কাঁকড়া (***Pinnotheres pisum***) দেখিনি,” বলেন ফটোগ্রাফার আন্দ্রে শপাতাক। এই ছবি তুলেই তিনি ২০২৫ সালের Oceanographic Wildlife Photographer of the Year প্রতিযোগিতায় ফাইনালিস্ট হন। মটর কাঁকড়া সাধারণত জীবনের বেশিরভাগ সময় ঝিনুকের ভেতরে কাটায়—একধরনের সহাবস্থান যা শেষ হয় তখনই, যখন ঝিনুক বা কাঁকড়ার মৃত্যু ঘটে। শপাতাকের ধারণা, ছবির কাঁকড়াটি হয়তো নতুন আশ্রয় খুঁজছিল।

Andrey Shpatak/Ocean Photographer of the Year

ঝলমলে উল্কাবৃষ্টি

এ বছরের পার্সেইড উল্কাবৃষ্টি ধরা পড়েছে যুক্তরাজ্যের ডরসেটের ১৪ কোটি বছরের পুরনো চুনাপাথরের খিলান Durdle Door-এর আকাশে। অ্যাস্ট্রোফটোগ্রাফার জশ ডুরি ধারণ করা ছবিতে দেখা যায়, উল্কার রেখাগুলো সবই পার্সেয়াস নক্ষত্রমণ্ডল থেকে আসছে। ছবির সোনালি কেন্দ্রীয় অংশটি আসলে মিল্কিওয়ের মূল ব্যান্ড, যা ধুলোমেঘে ঝলমল করছে।

Josh Dury

লাল গ্রহে নীল আকাশ

নাসার পারসিভিয়ারেন্স রোভার মঙ্গলের জেজেরো ক্রেটারে ধারণ করেছে এমন এক দৃশ্য, যেখানে আকাশ দেখতে কিছুটা পৃথিবীর মতোই স্বচ্ছ ও নীলাভ। ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে রোভারটি সেখানে মাটি ও শিলা সংগ্রহ করছে। ছবির ডান পাশে দেখা যায় রোভারের চাকায় তৈরি দাগ, যেখানে এটি খননকাজ চালাচ্ছিল। এ বছরের মার্চে বিজ্ঞানীরা ক্রেটারের একটি শিলায় প্রাচীন জীবাণুর জীবাশ্মের ইঙ্গিত পান। তবে নিশ্চিত হতে নমুনা পৃথিবীতে এনে বিশ্লেষণ করতে হবে।

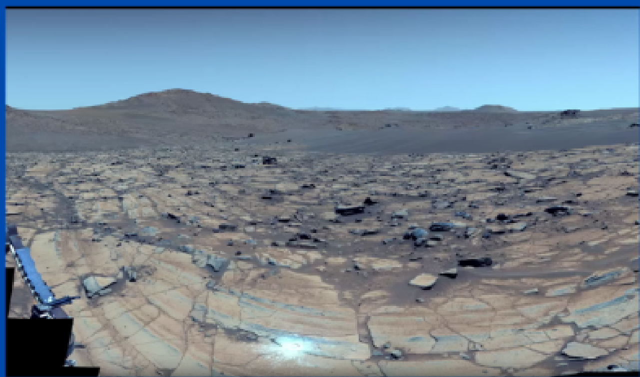

NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS

আগুনে পুড়ছে গ্রিস

১৩ আগস্ট গ্রিসে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ দাবানল হাজার হাজার মানুষ ও গবাদি পশুকে সরিয়ে নিতে বাধ্য করে। পাতরাস শহর ও চিওস ও জাকিনথোস দ্বীপসহ কয়েকটি এলাকা খালি করা হয়। গরম, শুষ্ক ও দমকা বাতাস একদিনেই ১৫০টিরও বেশি আগুন ছড়িয়ে দেয়। একই সময়ে দক্ষিণ ফ্রান্স ও উত্তর স্পেনেও দাবানল দেখা দেয়, তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়ে যায়।

Thanassis Stavrakis/Associated Press/Alamy

রংধনু বরফ

রংধনু বরফ

ইউরোপীয় ইউনিয়নের Copernicus Sentinel-1 স্যাটেলাইট থেকে প্রাপ্ত রাডার ইমেজে গ্রিনল্যান্ডের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে ৩১ জানুয়ারি থেকে ২০ মার্চ পর্যন্ত বরফের চলাচল ধরা পড়েছে। ছবির বিভিন্ন রঙ বরফের অগ্রগতি বা পিছু হটার সীমা বোঝায়। গড়ে গ্রিনল্যান্ড প্রতি বছর ২৩৪ বিলিয়ন টন বরফ হারাচ্ছে যা ১৯৯০-এর দশকের তুলনায় সাত গুণ বেশি।

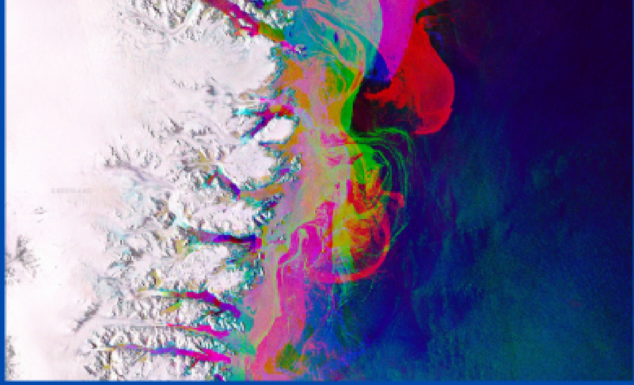

European Union, Copernicus Sentinel-1 imagery

Ezra Acayan/Getty

বন্যার মাঝেও উদযাপন

ফিলিপাইনের তিবাগুইন দ্বীপে ভয়াবহ বন্যার মধ্যেও মানুষ ভার্জিন মেরির মূর্তির আগমন উদযাপন করে। উপকূলীয় এলাকাগুলো ক্রমবর্ধমান সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতায় বারবার প্লাবিত হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন ও উপকূলীয় উন্নয়নের কারণে এমনকি সামান্য জোয়ারও কয়েক মিনিটের মধ্যে রাস্তাঘাট ও ঘরবাড়ি ডুবিয়ে দিচ্ছে।

ওয়েভি ডেভ

বিজ্ঞানীরা পরীক্ষামূলকভাবে তৈরি করেছেন এক রোবট কাঁকড়া, নাম Wavy Dave, যা দিয়ে পুরুষ ফিডলার কাঁকড়ার আচরণ বোঝা হয়েছে। দেখা গেছে, প্রতিদ্বন্দ্বীর পাঞ্জা বড় হলে পুরুষ কাঁকড়ারা কম প্রতিযোগিতা করে। তবে কিছু কাঁকড়া রোবটটিকে সন্দেহজনক মনে করে লড়াইয়ে নেমেছিল। এক পর্যায়ে এক কাঁকড়া রোবটটির পাঞ্জা ভেঙে দেয়, ফলে পরীক্ষা বন্ধ করতে হয়।

Joe Wilde

Tel Aviv University

হাইব্রিড শিশু

ইসরায়েলে পাওয়া এক শিশুর জীবাশ্মকৃত খুলি হয়তো মানুষ ও নিয়ান্ডারথালের (***Homo neanderthalensis***) মধ্যে প্রজননের প্রাচীনতম প্রমাণ। খুলিটি প্রায় ১,৪০,০০০ বছরের পুরনো এবং এতে হোমো সেপিয়েন্স ও নিয়ান্ডারথালের বৈশিষ্ট্য দুটোই রয়েছে। যদিও আমাদের জিনোমের মাত্র ১–৪% নিয়ান্ডারথাল থেকে এসেছে, অধিকাংশ বিনিময় ঘটেছে ৪০–৬০ হাজার বছর আগে।

গভীর সমুদ্রের রহস্য

আর্জেন্টিনার উপকূল থেকে ৩০০ কিলোমিটার দূরে Mar del Plata Submarine Canyon এ পাঠানো রিমোট-কন্ট্রোলড যান SuBastian আবিষ্কার করেছে নানা অদ্ভুত সামুদ্রিক প্রাণী। এখানে উষ্ণ লবণাক্ত স্রোত ও ঠান্ডা পুষ্টিসমৃদ্ধ স্রোত মিলিত হয়ে সমৃদ্ধ ইকোসিস্টেম তৈরি করেছে। প্রায় ৩,৫০০ মিটার গভীরে এই অভিযানে বিজ্ঞানীরা ৪০টিরও বেশি নতুন প্রজাতির সন্ধান পেয়েছেন।

Schmidt Ocean Institute

পদার্থবিজ্ঞান

গ্র্যাভিটি কি কোয়ান্টাম? উত্তরটা একটু জটিল

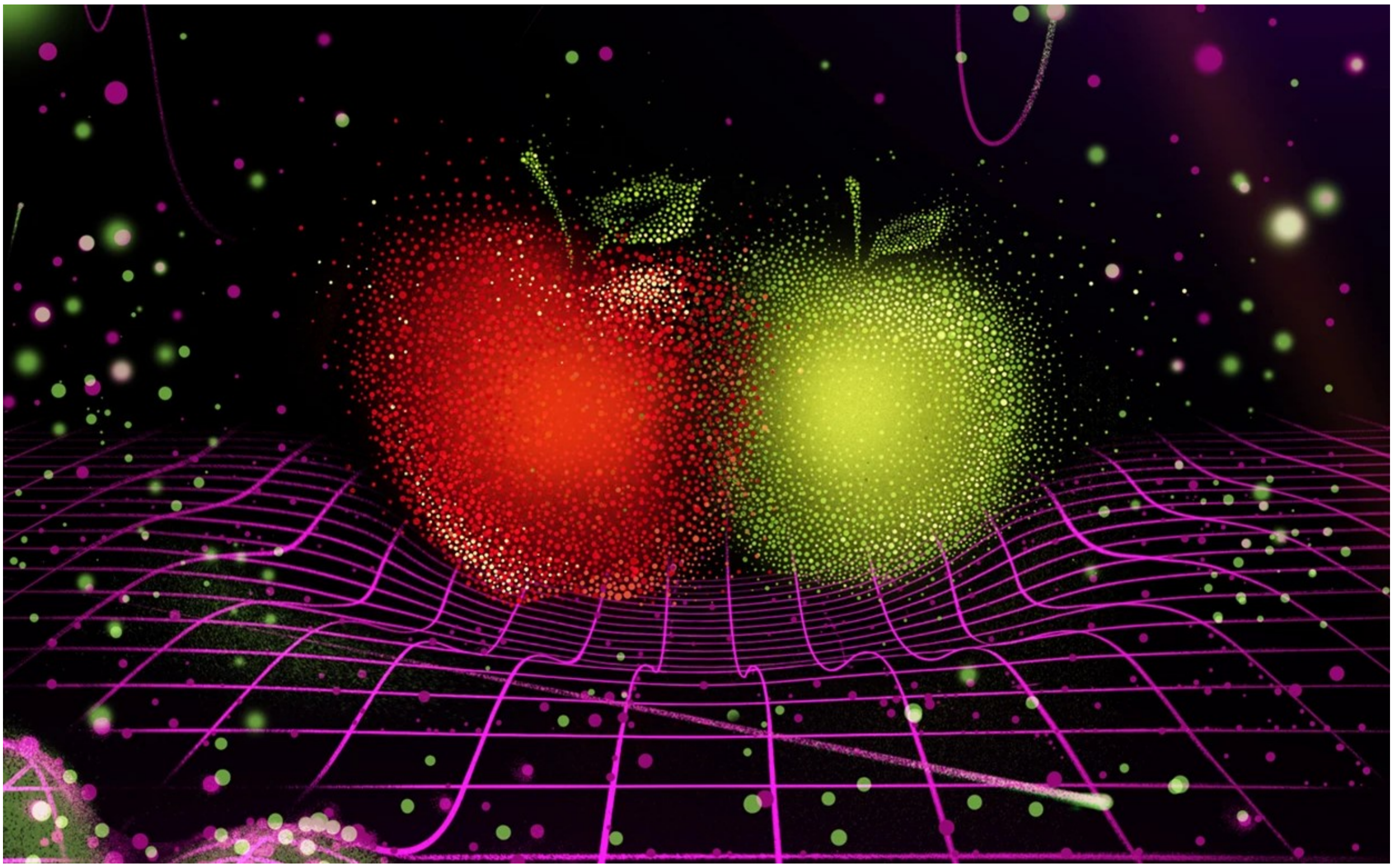

Adrià Voltà

কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞানকে প্রায়শই ইতিহাসের সবচেয়ে সফল বৈজ্ঞানিক কাঠামো হিসেবে বর্ণনা করা হয়। একশো বছরের বেশি সময় ধরে এটি ব্যাখ্যা করে আসছে মৌলগুলোর পর্যায় সারণি থেকে শুরু করে নক্ষত্র কীভাবে জ্বলে ওঠে, সবকিছুই। কিন্তু একটি মৌলিক ঘটনা এখনও এর আওতার বাইরে রয়ে গেছে, গ্র্যাভিটি বা মহাকর্ষ।

"কোয়ান্টাম মেকানিক্স আর গ্র্যাভিটি কীভাবে একসাথে মেলে, সেটাই পদার্থবিজ্ঞানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনিষ্পন্ন সমস্যাগুলোর একটি," বলছেন ক্যালিফোর্নিয়া ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি (Caltech), পাসাডেনার তাত্ত্বিক পদার্থবিদ ক্যাথরিন জুরেক।

প্রজন্মের পর প্রজন্ম গবেষকরা কোয়ান্টাম গ্রাভিটির একটি তত্ত্ব তৈরি করার চেষ্টা করেছেন। সেই প্রচেষ্টা থেকে এসেছে জটিল গাণিতিক কাঠামো, যেমন স্ট্রিং থিওরি। কিন্তু পরীক্ষামূলক পদার্থবিদরা এখনও এর কোন সুনির্দিষ্ট প্রমাণ খুঁজে পাননি, এমনকি কী ধরনের প্রমাণ খোঁজা উচিত, সেটাও নিশ্চিত নন।

তবে এখন এক ধরনের আশা তৈরি হয়েছে যে সঠিক সূত্র হয়তো সামনে এসে যাবে। গত এক দশকে অনেক গবেষক আশাবাদী হয়েছেন যে পরীক্ষাগারে গ্র্যাভিটির প্রকৃত স্বভাব যাচাই করার উপায় তৈরি হতে পারে। এ লক্ষ্যে নানা ধরনের পরীক্ষা প্রস্তাব করা হয়েছে, আর সেগুলো সম্ভব করার জন্য কৌশলগত নির্ভুলতাও ক্রমেই বাড়ছে। ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষামূলক পদার্থবিদ এবং এই ক্ষেত্রে পথিকৃৎ মার্কুস আসপেলমেয়ার বলেন, "পরীক্ষামূলক সামর্থ্য যেমন বেড়েছে, তেমনি আমাদের তাত্ত্বিক বোঝাপড়াও উন্নত হয়েছে যে এসব পরীক্ষার মাধ্যমে আসলে কী শেখা সম্ভব।"

প্রস্তাবিত পরীক্ষাগুলোর মধ্যে কিছুতে উন্নত মানের লেজার প্রযুক্তি দরকার হবে, যা কয়েক বছরের মধ্যেই তৈরি করা সম্ভব। তবে এমন কিছু পরীক্ষার জন্য পদার্থকে এতটাই সূক্ষ্মভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে যে সেগুলো হয়তো কখনোই বাস্তবায়িত হবে না। অবাক করা এক সম্ভাব্য ফলাফল হতে পারে, গ্র্যাভিটি আদৌ কোয়ান্টাম নয়।

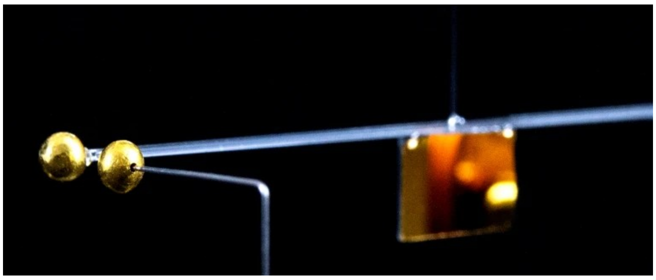

Westphal, T., et al./Nature

তবুও অনেক গবেষকের মতে অবশেষে এই ক্ষেত্রটি সঠিক পথে এগোচ্ছে। ক্যালটেকের আরেকজন পরীক্ষামূলক পদার্থবিদ লি ম্যাককালার বলেন, "আপনি যদি কিছু খুঁজতে চান, তাহলে খোঁজা শুরু করতেই হবে।"

গ্র্যাভিটির তত্ত্বসমূহ

গ্র্যাভিটির বর্তমানে স্বীকৃত তত্ত্ব হলো আলবার্ট আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব (General Theory of Relativity)। এই তত্ত্ব অনুযায়ী, গ্র্যাভিটি আসলে এমন এক প্রভাব যার মাধ্যমে পদার্থ একে অপরকে প্রভাবিত করে স্থান-কালের (space-time) বক্রতার মাধ্যমে। এটি অনেকটা ট্রাম্পোলিনের ওপর রাখা ভারী বলের মতো, যা চারপাশকে বেঁকিয়ে দেয় এবং অন্য বলগুলোর পথও পরিবর্তন করে।

সাধারণ আপেক্ষিকতা একটি ক্লাসিক্যাল (classical) তত্ত্ব, কোয়ান্টাম নয়। কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যায় কণাকে একগুচ্ছ সম্ভাবনার মেঘ হিসেবে বর্ণনা করা হয়, আর এর সঠিক অবস্থান কেবলমাত্র পরিমাপ করার পরই নির্ধারিত হয়। কিন্তু আইনস্টাইনের তত্ত্বে কণাকে সবসময় নির্দিষ্ট স্থান আর নির্দিষ্ট গতিপথে বিদ্যমান বস্তু হিসেবে দেখা হয়।

সুইস ফেডারেল ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি (ETH), জুরিখ-এর পদার্থবিদ ফ্লামিনিয়া জিয়াকোমিনি বলেন, গ্র্যাভিটিকে কোয়ান্টাম হিসেবে দেখার ধারণা ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বহন করে। তবে বিজ্ঞানীরা সাধারণত একমত যে যেকোনো কোয়ান্টাম গ্রাভিটি তত্ত্বে কণাগুলোকে অস্পষ্ট সম্ভাবনার বণ্টন (fuzzy probability distributions) হিসেবে দেখা উচিত, নির্দিষ্ট অবস্থান নয়। কিছু তত্ত্ব আরও দাবি করে যে স্থান-কাল নিজেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকরোতে ('quanta') গঠিত, আইনস্টাইনের মসৃণ space-time নয়। তবে জিয়াকোমিনির মতে, এটা একেবারেই স্বতঃসিদ্ধ নয় যে এর মানেই গ্র্যাভিটি কোয়ান্টাম।

কোয়ান্টাম গ্রাভিটির প্রাথমিক প্রচেষ্টা

১৯৬০-এর দশকে কোয়ান্টাম গ্রাভিটির একটি তত্ত্ব তৈরি করার প্রথম দিককার প্রচেষ্টায়, তাত্ত্বিক পদার্থবিদরা চেষ্টা করেছিলেন সাধারণ আপেক্ষিকতাকে এমন এক গাণিতিক প্রক্রিয়ায় প্রবাহিত করতে, যা ক্লাসিক্যাল সমীকরণকে কোয়ান্টামে রূপান্তরিত করে (এবং নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যযুক্ত বস্তুকে পরিণত করে সম্ভাবনার অস্পষ্ট মেঘে)। এই কৌশল প্রকৃতির আরেকটি মৌলিক শক্তি, তড়িৎচুম্বকত্বের (electromagnetism) ক্ষেত্রে ভালো কাজ করেছিল। কিন্তু আইনস্টাইনের তত্ত্বে এটি প্রয়োগ করার পর ফল দাঁড়ায় অর্থহীন, যেমন, কিছু মান অসীমে গিয়ে পৌঁছায়।

শূন্য থেকে কোয়ান্টাম গ্রাভিটির তত্ত্ব গড়ার প্রচেষ্টা অবশ্য কিছু গাণিতিকভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ ফলাফল দিয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় হলো স্ট্রিং থিওরি, যেখানে বলা হয় যে প্রাথমিক কণাগুলো আসলে অদৃশ্য মাত্রার ভেতরে কম্পনরত ক্ষুদ্র স্ট্রিং। নীতিগতভাবে, এটি পরিচিত প্রাথমিক কণাতত্ত্বের কিছু বিভ্রান্তি দূর করতে পারে এবং এমন নতুন কণার পূর্বাভাস দেয়, যেগুলো পদার্থবিদরা গ্র্যাভিটি কোয়ান্টা বা 'গ্রাভিটন' হিসেবে আশা করেন।

এটি এক অর্থে গ্র্যাভিটিকে কোয়ান্টাম তত্ত্বে রূপ দেয়। কিন্তু গবেষকরা স্ট্রিং থিওরির কিছু সংস্করণের পরীক্ষামূলক প্রমাণ খুঁজলেও এখনো কিছুই পাননি। একই অবস্থা লুপ কোয়ান্টাম

গ্রাভিটি-র ক্ষেত্রেও। এটি আরও র‍্যাডিকাল একটি দৃষ্টিভঙ্গি, যেখানে শুধু প্রাথমিক কণাই নয়, পুরো স্থান-কালের গঠনকেও ক্ষুদ্র লুপ দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা হয়।

অনেক পদার্থবিদ এমন জটিল কাঠামোর (যেমন স্ট্রিং থিওরি) পরীক্ষামূলক যাচাই সম্ভব না হওয়ায় হতাশ হয়ে পড়েছেন। যুক্তরাজ্যের সাউদাম্পটন বিশ্ববিদ্যালয়ের তাত্ত্বিক পদার্থবিদ ইভেট ফুয়েন্তেস বলেন, “আমার মনে হয় মানুষ এখন এর প্রতি আগ্রহ হারাচ্ছে।”

পরীক্ষার দিকে ঝোঁক

নতুন নতুন কোয়ান্টাম গ্রাভিটি তত্ত্ব ডিজাইন করার পরিবর্তে এখন কিছু গবেষক ল্যাব পরীক্ষার মাধ্যমে খুঁজছেন মৌলিক উত্তর, গ্র্যাভিটি আসলে ক্লাসিক্যাল, না কি মূলত কোয়ান্টাম প্রকৃতির।

লন্ডনের রয়্যাল হলোওয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষামূলক পদার্থবিদ রিচার্ড হাওয়েল বলেন, “আমাদের কাছে কোনো পরীক্ষামূলক প্রমাণ নেই যে গ্র্যাভিটি কীভাবে কোয়ান্টামে রূপান্তরিত হয় বা আদৌ গ্র্যাভিটি কোয়ান্টাম কি না।”

ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কুস আসপেলমেয়ার বলেন, “আমার কাছে সবচেয়ে দারুণ ব্যাপার হবে একটা সোজাসাপ্টা হ্যাঁ-না পরীক্ষাই।”

গবেষকদের সামনে বড় প্রশ্নগুলোর একটি হলো কোয়ান্টামের ‘সুপারপজিশন’ (superposition) ঘটনা যেখানে একটি বস্তু একসাথে দুটি অবস্থায় থাকতে পারে, যেমন বিপরীত দিকে ঘোরা বা একসাথে দুটি ভিন্ন পথে চলা। সাধারণ আপেক্ষিকতার যেকোনো কোয়ান্টাম সংস্করণে, একটি কণার বিলিয়ার্ড বলের মতো প্রভাব সম্ভবত স্থান-কালের ওপর সুপারপজিশন তৈরি করবে, একইসাথে দুটি পথে স্থান বাঁকানো।

এখন প্রশ্ন হলো, দ্বিতীয় একটি বল সেই গ্র্যাভিটির আকর্ষণ কেমন অনুভব করবে? সেটি কি একসাথে দুটি পথে পড়বে, নিজের গতিপথকে বিভক্ত করে? নাকি যদি সুপারপজিশন না ঘটে, তবে হয়তো এটি মাঝামাঝি কোনো পথে পড়বে, দুই আকর্ষণকে গড় করে?

আবার, দ্বিতীয় বলটির উপস্থিতিই কি প্রথম বলটিকে বাধ্য করবে একটি নির্দিষ্ট পথ “নির্বাচন” করতে যেমন একটি পরিমাপক যন্ত্র কণাকে তার অবস্থান প্রকাশ করতে বাধ্য করে?

গত এক দশকে তাত্ত্বিকরা বুঝতে পেরেছেন যে এই ধারণাগুলোকে পরীক্ষামূলকভাবে আলাদা করা সম্ভব এন্ট্যাংলমেন্ট (entanglement) নামের এক অদ্ভুত কোয়ান্টাম ঘটনার মাধ্যমে। কোয়ান্টাম মেকানিক্সে যখন দুটি বস্তু একে অপরের সাথে ক্রিয়া করে, তারা একটি যৌথ বা ‘এন্ট্যাংলড’ অবস্থায় প্রবেশ করতে পারে। এর মানে হলো প্রথম বস্তুর কোনো বৈশিষ্ট্য মাপা হলে সেটি নির্দিষ্ট মান পায়, আর একইসাথে দ্বিতীয় বস্তুর সংশ্লিষ্ট বৈশিষ্ট্যও নির্ধারিত হয়।

Aspelmeyer Group/University of Vienna/OEAW

মূল ধারণাটি হলো যদি দুটি বস্তু কেবলমাত্র তাদের পারস্পরিক গ্র্যাভিটির আকর্ষণের মাধ্যমে (অন্য কোনো ক্রিয়া ছাড়াই) এন্ট্যাংলড হতে পারে, তবে গ্র্যাভিটি অবশ্যই কোয়ান্টাম প্রকৃতির।

সবকিছু শুনতে বিমূর্ত মনে হলেও গবেষকেরা ইতিমধ্যে এটিকে বাস্তবায়নের নানা পরিকল্পনা তৈরি করছেন।

অ্যাসপেলমেয়ারের কল্পিত পরীক্ষা

অ্যাসপেলমেয়ারের প্রস্তাবিত এক পরীক্ষায় শূন্যস্থানে (vacuum) একটি ক্ষুদ্র কণাকে এমন এক সুপারপজিশনে রাখা হবে, যেখানে সেটি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানে একসাথে

থাকতে পারে। এরপর গবেষকরা পর্যবেক্ষণ করবেন, নিকটবর্তী আরেকটি কণা, যেটি প্রথমটির গ্র্যাভিটির আকর্ষণ ছাড়া আর কোনো বল অনুভব করবে না, তার সাথে এন্ট্যাংলড হয়েছে কিনা।

এই পরীক্ষা সম্ভব করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি উন্নত করার কাজের অগ্রভাগে রয়েছেন অ্যাসপেলমেয়ার, যদিও পুরো পরীক্ষাটি এখনই করা সম্ভব নয়।

সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো, কোনো বস্তুকে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানে সুপারপজিশনে রাখা যত বড় হয়, তত বেশি কঠিন হয়ে ওঠে কারণ দৈনন্দিন জীবনের বৃহৎ স্কেলে তো আমরা কখনোই এমন প্রভাব দেখি না।

এখন পর্যন্ত গবেষকেরা হাজার হাজার পরমাণুর তৈরি অণুর ক্ষেত্রে এটি করতে পেরেছেন। এছাড়া তারা কিছু বড় বস্তুর (যেমন লেজার বিম দিয়ে ভাসিয়ে রাখা ক্ষুদ্র কাঁচের গোলক) ক্ষেত্রে কোয়ান্টাম আচরণের অন্যান্য দিকও পর্যবেক্ষণ করেছেন। অ্যাসপেলমেয়ারের মতে, একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল কণার গতি এতটাই ধীর করা যাতে তাদের গতিবিধিতে কোয়ান্টাম প্রকৃতি প্রকাশ পায়। উদাহরণস্বরূপ, যখন কণাকে একটি তড়িৎচুম্বকীয় ক্ষেত্রে আটকে রাখা হয়, তখন তারা বিচ্ছিন্ন শক্তিস্তর (discrete energy levels) অর্জন করে। এই কৃতিত্ব প্রথম অর্জিত হয় ২০২০ সালে।

অ্যাসপেলমেয়ারের স্বপ্নের পরীক্ষায় দুই বস্তুকে কেবল কোয়ান্টাম আচরণই দেখাতে হবে না, বরং পর্যাপ্ত ভরও থাকতে হবে যাতে তারা একে অপরের ওপর যথেষ্ট গ্র্যাভিটির আকর্ষণ প্রয়োগ করতে পারে। কিন্তু গ্র্যাভিটি এতটাই দুর্বল বল যে এর জন্য প্রয়োজন অন্তত ২২ মাইক্রোগ্রাম ভর, অর্থাৎ এতে থাকতে হবে কোয়ান্টিলিয়ন সংখ্যক পরমাণু।

অ্যাসপেলমেয়ার এখনও এত ক্ষুদ্র গ্র্যাভিটির বল মাপতে সক্ষম নন। তবে ২০২১ সালে তিনি অনেক বড় ভর (৯০ মিলিগ্রাম) এর ক্ষেত্রে এটি করতে পেরেছিলেন। তিনি দুটি ভরকে একটি ক্ষুদ্র দণ্ডের দুই প্রান্তে বসিয়ে দেন, যা মাঝখানে সুতো দিয়ে ঝুলিয়ে রাখা ছিল। এরপর আরেকটি ৯০-মিলিগ্রাম ভর দণ্ডের এক প্রান্তের কাছে নিয়ে আসেন এবং দণ্ডের ঘূর্ণন মেপে গ্র্যাভিটির আকর্ষণের প্রভাব নির্ণয় করেন।

ক্ষুদ্র বস্তুর গ্র্যাভিটি ক্ষেত্র মাপার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো এগুলোকে অন্য প্রভাব থেকে আলাদা রাখা খুব কঠিন কারণ অন্যান্য বল সাধারণত গ্র্যাভিটির চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। অথচ অ্যাসপেলমেয়ারের কল্পিত পরীক্ষার জন্য এমন পৃথকীকরণ অপরিহার্য, যাতে গবেষকেরা নিশ্চিত হতে পারেন যে কোনো প্রভাব কেবল গ্র্যাভিটির কারণেই ঘটছে।

বোসের প্রস্তাবিত পরীক্ষা

ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনের (UCL) তাত্ত্বিক পদার্থবিদ সৌগত বোস ও তার সহকর্মীরা একটি সম্পর্কিত পরীক্ষার প্রস্তাব করেছেন এবং আংশিক অর্থায়নও পেয়েছেন। ধারণাটি হলো কণাগুলোকে মুক্তপতনে রাখা। তারা প্রস্তাব করেছেন ক্ষুদ্র হীরার স্ফটিককে এমন এক সুপারপজিশনে রাখা, যাতে সেটি একইসাথে দুটি সমান্তরাল পথে পতন করে। আরেকটি একই ধরনের স্ফটিককেও একইভাবে রাখা হবে।

(এটি করা হয় প্রতিটি স্ফটিকে একটি স্পিন অবস্থাকে সুপারপজিশনে রেখে এবং তারপর চৌম্বক ক্ষেত্র প্রয়োগ করে; কারণ স্পিন—যা উপ-পরমাণু কণার একটি কোয়ান্টাম বৈশিষ্ট্য—একটি ক্ষুদ্র চুম্বকের মতো আচরণ করে। ফলে স্পিন কোন দিকে নির্দেশ করছে তার ওপর ভিত্তি করে স্ফটিকগুলো ভিন্নভাবে বিকৃত হয়।)

ফলে মোট চারটি সমান্তরাল পথ তৈরি হবে, যা দুটি স্ফটিককে বিভিন্ন দূরত্বে রাখবে। এভাবে তারা ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার গ্র্যাভিটির আকর্ষণের সুপারপজিশনে থাকবে।

শেষে প্রতিটি স্ফটিককে আবার একটি পথে একত্রিত করা হবে। তাদের কোয়ান্টাম অবস্থার পাঠ থেকে বোঝা যাবে তারা এন্ট্যাংলড হয়েছে কিনা। আর যুক্তি হলো যদি হয়ে থাকে, তবে সেটা কেবল গ্র্যাভিটির মাধ্যমেই সম্ভব।

তবে বোসের মতে, প্রতিটি ধাপই অত্যন্ত কঠিন এবং এটি পরীক্ষামূলকভাবে সম্ভব করতে কয়েক দশক লেগে যেতে পারে। (অন্য দলও একই ধরনের প্রস্তাব দিয়েছে।)

অন্য পরীক্ষার পথ

যদিও বোস ও অনেকে মনে করেন এন্ট্যাংলমেন্ট সৃষ্টি করার ক্ষমতাই গ্র্যাভিটিকে কোয়ান্টাম প্রমাণের মূল চাবিকাঠি, অন্যদের মতে বাস্তবতা আরও সূক্ষ্ম হতে পারে।

ক্যালিফোর্নিয়ার লরেন্স বার্কলে ন্যাশনাল ল্যাবরেটরির তাত্ত্বিক পদার্থবিদ ড্যানিয়েল কার্নি বলেন, "আপনি আসলে প্রমাণ করছেন না যে গ্র্যাভিটি কোয়ান্টাম; বরং একটা মডেল বানাচ্ছেন যে গ্র্যাভিটি কোয়ান্টাম না হলে কেমন হতো, আর সেটিকে বাতিল করার চেষ্টা করছেন।"

তিনি বলেন, যদি গ্র্যাভিটি বস্তুগুলিকে এন্ট্যাংলড করতে পারে, তবে সেটা নিশ্চয়ই ক্লাসিক্যাল নয়। তবে এর মানে পুরো গ্র্যাভিটি ক্ষেত্রের গঠন কীভাবে দাঁড়ায়, সেটি খোলা প্রশ্ন।

আরেকটি পথ তৈরি করেছেন রিচার্ড হাওয়েল, ইভেট ফুয়েন্তেস এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের তাত্ত্বিক বিজ্ঞানী রজার পেনরোজ। এতে একটি বোস–আইনস্টাইন কনডেনসেট – BEC (অত্যন্ত শীতল পরমাণুর মেঘ) একক কোয়ান্টাম অবস্থায় ঝুলিয়ে রাখা হয়। এরপর এর স্ব-গ্র্যাভিটি অনুযায়ী ভিন্নভাবে বিকাশ ঘটে, যা নির্ভর করে গ্র্যাভিটি কোয়ান্টাম নাকি ক্লাসিক্যাল।

বিশেষত, ক্লাসিক্যাল গ্র্যাভিটি কখনোই BEC-র কণার অবস্থানকে ঘণ্টার মতো একক-শৃঙ্গ বণ্টন (single peak) থেকে বহুশৃঙ্গ বণ্টনে (multiple peaks) রূপান্তর করবে না। আরেকটি BEC দিয়ে প্রথমটির ওপর পরীক্ষা চালিয়ে এই পরিবর্তন হয়েছে কিনা মাপা সম্ভব, বলেন হাওয়েল।

এখানেও বড় চ্যালেঞ্জ রয়েছে। সাধারণত একটি BEC কয়েক মিলিয়ন পরমাণু নিয়ে গঠিত হয়। কিন্তু গ্র্যাভিটির আকর্ষণ মাপার জন্য এটি প্রায় এক কোটি গুণ বড় হতে হবে, ফুয়েন্তেসের মতে। যদিও বিভিন্ন কোয়ান্টাম-প্রযুক্তিগত কৌশল এ প্রয়োজন কিছুটা কমাতে পারে।

লেজার টেবিলটপ পরীক্ষা

কিছু কোয়ান্টাম গ্রাভিটি ধারণা পরীক্ষাগারে তুলনামূলকভাবে সহজে যাচাই করা সম্ভব হতে পারে। এর একটি উদাহরণ হলো ক্যাথরিন জুরেক এবং তার সহকর্মীদের তৈরি ভিন্ন ধরনের কোয়ান্টাম গ্রাভিটি তত্ত্ব। এতে স্ট্রিং থিওরি বা সাধারণ আপেক্ষিকতাকে সরাসরি কোয়ান্টাইজ করার চেষ্টা নেই। বরং শুরু হয় সাধারণ আপেক্ষিকতার মৌলিক সামঞ্জস্য (symmetry) থেকে যেমন, পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের সাথে সাথে সময় কীভাবে ভিন্নভাবে প্রবাহিত হয়, সেই নিয়মগুলো।

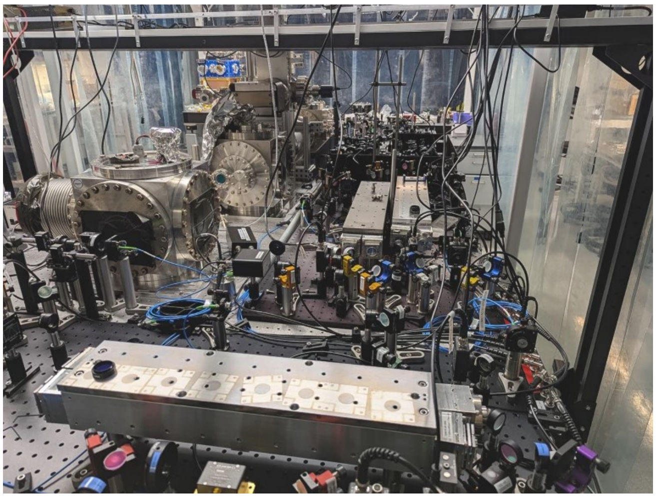

Lee McCuller, Caltech

জুরেক বলেন, তার তত্ত্ব অনুযায়ী যদি মহাকর্ষের একটি কোয়ান্টাম প্রকৃতি থাকে, তাহলে তা শনাক্তযোগ্য ঘটনা তৈরি করবে যেমন স্থান-কালের বুনটে একটি স্থায়ী, এলোমেলো দুলুনি।

ম্যাককালার এখন একটি পরীক্ষামূলক পদ্ধতি তৈরি করছেন, যার নাম Gravity from the Quantum Entanglement of Space Time (GQuEST)। আগামী বছর প্রাথমিক প্রমাণ-স্বরূপ কাজ শেষ হওয়ার কথা। উপরিভাগে, GQuEST দেখতে কিছুটা টেবিল-টপ সংস্করণের মতো হবে লেজার ইন্টারফেরোমিটার গ্র্যাভিটেশনাল-ওয়েভ অবজারভেটরি (LIGO)–এর, যে

ডিটেক্টরগুলো ২০১৫ সালে মহাকর্ষীয় তরঙ্গের আবিষ্কার করেছিল। একটি LIGO ডিটেক্টরে লেজার রশ্মিকে দুই ভাগে বিভক্ত করে L-আকৃতির দুই বাহু দিয়ে পাঠানো হয়। এরপর দুই রশ্মি আয়নায় প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে এবং কেন্দ্রে মিলিত হয়।

LIGO–এর সংবেদনশীলতা বাড়ানোর কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা ম্যাককালার এখন একই ধরনের একটি পরিকল্পনা ব্যবহার করছেন এলোমেলো স্থান-প্রসারণ শনাক্ত করতে। জুরেকের তত্ত্ব (যা এখনো সম্পূর্ণ নয়) এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী করে: সংকেতটি হবে বিরল আলোককণা (ফোটন) আকারে, যার ফ্রিকোয়েন্সি লেজারের নিচে হবে। ম্যাককালার বলেন, এই ফোটনগুলোকে রশ্মি থেকে আলাদা করতে হলে তাকে অভাবনীয় দক্ষতায় ফিল্টার করতে হবে, যেমন এক লিটার পানির ভেতর থেকে একটি মাত্র অণু বের করে আনার মতো। তিনি বলেন, "সবাই বলে, 'আমি তখনই বিশ্বাস করব যখন দেখব'।" কিন্তু তিনি আত্মবিশ্বাসী যে তিনি এটি করতে পারবেন।

পোস্ট-কোয়ান্টাম তত্ত্ব

এখনো সম্ভব যে একটি ধ্রুপদী (ক্লাসিকাল) মহাকর্ষ কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞানের সঙ্গে পাশাপাশি থাকতে পারে। একসময় এই ধারণাকে ধর্মবিরোধী ধরা হতো, গবেষকরা যুক্তি দিয়েছিলেন যে এটি যুক্তিগতভাবে অসম্ভব।

কিন্তু এখন বিষয়টি বেশি গুরুত্বের সঙ্গে নেওয়া হচ্ছে, আংশিকভাবে জনাথন ওপেনহাইমের (ইউসিএল–এর একজন তাত্ত্বিক পদার্থবিদ) তৈরি একটি মডেলের কারণে। তার 'পোস্ট-কোয়ান্টাম' তত্ত্বে মহাকর্ষ ও স্থান-কাল ধ্রুপদী, তবে এগুলো এলোমেলো ওঠানামার (ফ্লাকচুয়েশন) অধীন।

এর মূল্য হলো পদার্থবিজ্ঞানকে স্বভাবতই অ-নির্ধারিত (non-deterministic) ধরা যা অনেক পদার্থবিদের কাছে মানা কঠিন। তবে এর মাধ্যমে আগের গবেষকদের পাওয়া যুক্তিগত অসম্ভবতাকে পাশ কাটানো সম্ভব হয়, কারণ তারা ধরে নিয়েছিলেন যে নির্ধারণবাদ (determinism) ভাঙা যাবে না। ওপেনহাইম বলেন, "মূল উপলব্ধি ছিল যে স্থান-কাল ও কোয়ান্টাম মেকানিক্স সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে, যতক্ষণ না পূর্বাভাস দেওয়ার ক্ষমতায় ভাঙন থাকে।" একই সময়ে তার তত্ত্ব আরেকটি ধাঁধারও সমাধান দিতে পারে: ব্ল্যাক হোল কেন ধীরে ধীরে বাষ্পীভবনের সময় তথ্য মুছে ফেলে বলে মনে হয়। প্রখ্যাত পদার্থবিদ স্টিফেন হকিং অর্ধশতাব্দী আগে এটি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। এটি নির্ধারণবাদের লঙ্ঘন মনে হলেও ওপেনহাইমের তত্ত্বে এটি আর কোনো ধাঁধা থাকে না।

নিজের তত্ত্ব বিকাশের পাশাপাশি ওপেনহাইম এটিকে পরীক্ষার কিছু উপায়ও প্রস্তাব করেছেন। একটি হলো তার মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের ওঠানামার স্বাক্ষর খুঁজে বের করা, যা মুক্তপতনরত বস্তুর গতিতে ক্ষুদ্র, এলোমেলো ধাক্কার মতো প্রকাশ পাবে।

ওপেনহাইম ও অন্যরা ইউরোপীয় মহাকাশ সংস্থার LISA Pathfinder প্রোবের (২০১৫ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে সংগৃহীত) তথ্য বিশ্লেষণ করেছেন। এই প্রোব মুক্তপতনরত বস্তু ধারণ করে মাপজোক করেছিল, পরবর্তী মহাকর্ষীয় তরঙ্গ সনাক্তকরণের প্রস্তুতি হিসেবে। এখনো কোনো চিহ্ন মেলেনি তবে এর মানে হতে পারে প্রোব যথেষ্ট সংবেদনশীল ছিল না। ওপেনহাইম বলেন, আরও কঠোর পরীক্ষা আসতে পারে ম্যাককালারের পরীক্ষার মাধ্যমে কিংবা পূর্ণাঙ্গ LISA মিশন থেকে, যা ২০৩০–এর দশকে মহাকাশে মহাকর্ষীয় তরঙ্গ শনাক্ত করার লক্ষ্য নিয়েছে।

কার্নিও তার সহকর্মীদের সঙ্গে একটি তত্ত্ব তৈরি করেছেন, যা কোয়ান্টাম ছাড়াই মহাকর্ষ ব্যাখ্যা করতে পারে। তার মডেল পুরোনো একটি ধারণার অনুসারী, যেখানে ধরা হয় মহাকর্ষ আসলে প্রকৃতির অগোছালো অবস্থার দিকে ঝোঁকার (এন্ট্রোপি বৃদ্ধির) ফলাফল।

অন্যান্য অ-কোয়ান্টাম ব্যাখ্যার মতো এটিও জগতে কিছুটা অনিশ্চয়তা (unpredictability) যোগ করে। কার্নি এখন ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, বার্কলির পরীক্ষামূলক পদার্থবিদ হোলগার মুলারের সঙ্গে কাজ করছেন। তারা সুনির্দিষ্ট

ভবিষ্যদ্বাণী যাচাই করছেন, যেখানে শূন্যে মুক্তপতনরত পরমাণুর গতিতে এলোমেলো কম্পন খুঁজে দেখা হচ্ছে। কার্নি বলেন, তিনি এখনো বাজি ধরবেন যে মহাকর্ষ আসলেই কোয়ান্টাম, এবং এসব অ-কোয়ান্টাম ব্যাখ্যাকে তিনি দূরবর্তী সম্ভাবনা মনে করেন। তবে পরীক্ষাটি করার মতোই মূল্যবান। তার ভাষায়, "আপনি সত্যিই এটিকে পরীক্ষা করার কথা ভাবতে পারেন। আর আমার কাছে সেটিই ভীষণ উত্তেজনাপূর্ণ।"

এটিও সম্ভব যে মহাকর্ষ শেষ পর্যন্ত ধ্রুপদী বা কোয়ান্টাম, কোনোটিই নয়, এবং একেবারে নতুন ধারণার প্রয়োজন পড়বে, বলেন সাবিনা হোসেনফেল্ডার, মিউনিখ সেন্টার ফর ম্যাথমেটিকাল ফিলোসফির একজন তাত্ত্বিক পদার্থবিদ।

আর কেউ কেউ বলেন, এমনকি স্ট্রিং তত্ত্বকেও পরীক্ষা করার উপায় থাকতে পারে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের তাত্ত্বিক পদার্থবিদ জোসেফ কনলন বলেন, "নিশ্চিতভাবে উত্তর দেবে এমন পরীক্ষা পাওয়া ভীষণ কঠিন" যদিও ভাগ্য ভালো হলে সম্ভব।

উদাহরণস্বরূপ, নিউট্রন তারার কম্পন পর্যবেক্ষণ করে দীর্ঘ-তরঙ্গদৈর্ঘ্যের মহাকর্ষীয় বিকিরণ নিয়ে গবেষণা করা জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা স্ট্রিং তত্ত্বের কল্পিত ফল 'কসমিক স্ট্রিং'–এর স্বাক্ষর খুঁজছেন, যা সারা মহাবিশ্বজুড়ে বিস্তৃত হতে পারে। আবার স্ট্রিংয়ের প্রকৃতি প্রকাশ পেতে পারে মহাবিস্ফোরণের চরম উচ্চ শক্তিতে। তখন সৃষ্ট হতে পারে খুব স্বল্প-তরঙ্গদৈর্ঘ্যের মহাকর্ষীয় তরঙ্গ, যা এখন তৈরি হওয়া টেবিল-টপ যন্ত্রে শনাক্ত করা সম্ভব হবে।

প্রস্তাবিত বেশিরভাগ পরীক্ষাই অন্তত এক দশক পর কার্যকর হবে, কিছু ক্ষেত্রে আরও বেশি সময় লাগতে পারে। কিন্তু মৌলিক পদার্থবিজ্ঞানে দীর্ঘ অচলাবস্থার পর এখন অনেকেই আশাবাদী। "আমার মনে হয়, এটি কোয়ান্টাম-মহাকর্ষ গবেষণার এক নতুন যুগ," বলেন ওপেনহাইম, "এখন আমরা প্রকৃতির সঙ্গে সরাসরি আলাপচারিতা করতে পারি, শুধুমাত্র অন্ধকারে দাঁড়িয়ে মডেল বানানোর কাজই করতে হয় না।"

লেখক: তানভীর রানা রাব্বি

স্বাস্থ্য

প্রথমবারের মতো মানুষের শরীরে শূকরের ফুসফুস প্রতিস্থাপন

গবেষকরা প্রথমবার মানুষের শরীরে জেনেটিকভাবে পরিবর্তিত শূকরের ফুসফুস প্রতিস্থাপন করেছেন। যদিও রোগী মস্তিষ্ক-মৃত ছিলেন, ফুসফুসটি নয় দিন কার্যকর ছিল। এটি ভবিষ্যতে শূকরের অঙ্গ প্রতিস্থাপনের সম্ভাবনা উজ্জ্বল করছে, বিশেষত তাদের জন্য যাদের জীবন দাতা অঙ্গের অভাবে ঝুঁকির মধ্যে থাকে।

Xijing Hospital of the Air Force Medical University/Xinhua/Alamy

প্রথমবারের মতো একটি জেনেটিকভাবে পরিবর্তিত শূকরের ফুসফুস মানুষের শরীরে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। চীনের ৩৯ বছর বয়সী এক ব্রেইন-ডেড ব্যক্তির শরীরে এই প্রতিস্থাপন করা হয় এবং ফুসফুসটি নয় দিন পর্যন্ত কার্যকর ছিল।

যুক্তরাষ্ট্র ও চীনে অন্তত আধা ডজন মানুষ ইতিমধ্যেই জিনোম-সম্পাদিত শূকরের অঙ্গ পেয়েছেন, যার মধ্যে রয়েছে হৃদপিণ্ড, কিডনি, লিভার ও থাইমাস। সর্বশেষ এই ফুসফুস প্রতিস্থাপন গবেষকদের মতে ইঙ্গিত দিচ্ছে যে ভবিষ্যতে শূকরের প্রায় যেকোনো অঙ্গ মানুষে প্রতিস্থাপন করা সম্ভব হতে পারে। প্রতি বছর হাজারো মানুষ দাতার অভাবে মৃত্যুবরণ করে; এই প্রযুক্তি একদিন তাদের জীবন বাঁচাতে পারে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন গবেষকরা।

মেরিল্যান্ড ইউনিভার্সিটি স্কুল অব মেডিসিনের সার্জন ও গবেষক মুহাম্মদ মোহিউদ্দিন, যিনি ২০২২ সালে প্রথমবার জীবিত মানুষের শরীরে শূকরের হৃদপিণ্ড প্রতিস্থাপন করেছিলেন, বলেন—ফুসফুস প্রতিস্থাপন সবচেয়ে জটিল কাজ। কারণ, প্রতিস্থাপনযোগ্য অঙ্গগুলোর মধ্যে ফুসফুসে সবচেয়ে বেশি রক্তনালী থাকে। এতে রোগীর প্রতিরোধ ব্যবস্থা সহজেই আক্রমণ চালায়, ফলে রক্ত জমাট বাঁধা ও টিস্যু ক্ষতির ঝুঁকি বেশি থাকে। মোহিউদ্দিন বলেন, "তাদের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। এটি ফুসফুস প্রতিস্থাপনের দিকে প্রথম পদক্ষেপ।" এদিকে এ বছর যুক্তরাষ্ট্রে শূকরের কিডনি ও লিভার প্রতিস্থাপনের ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

চীনের চেংদু ক্লোনঅর্গান বায়োটেকনোলজি (Chengdu Clonorgan Biotechnology) নামক গবেষণা প্রতিষ্ঠান বিশেষভাবে পরিবর্তিত একটি শূকরের ফুসফুস সরবরাহ করে। এতে মোট ছয়টি জিনোমিক পরিবর্তন আনা হয়েছিল—তিনটি শূকরের জিন অপসারণ করা হয় যাতে প্রতিরোধ ব্যবস্থা অঙ্গটিকে ফরেইন হিসেবে না চেনে, আর তিনটি মানব জিন যুক্ত করা হয় অঙ্গকে প্রত্যাখ্যান থেকে রক্ষা করার জন্য।

২০২৪ সালের ১৫ মে চীনের গুয়াংজু মেডিকেল ইউনিভার্সিটির ফার্স্ট অ্যাফিলিয়েটেড হাসপাতালে এই ফুসফুস প্রতিস্থাপন করা হয়। তাদের গবেষণা সাম্প্রতিক *Nature Medicine* জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।

প্রথম তিন দিন প্রতিস্থাপিত ফুসফুসে প্রত্যাখ্যান, সংক্রমণ বা অঙ্গ ব্যর্থতার কোনো লক্ষণ দেখা যায়নি। তবে প্রতিস্থাপনের ২৪ ঘণ্টা পর ফুসফুসে ফোলাভাব ও অক্সিজেনবিহীন অবস্থায় ক্ষতির চিহ্ন পাওয়া যায়। তৃতীয় ও ষষ্ঠ দিনে অ্যান্টিবডি আক্রমণজনিত কিছু ক্ষতি দেখা গেলেও নবম দিনে তা কিছুটা কমে আসে। পরে রোগীর পরিবারের অনুরোধে গবেষণা বন্ধ করা হয়।

অস্ট্রেলিয়ার সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রান্সপ্ল্যান্ট সার্জন ওয়েইন হথর্ন বলেন, পরবর্তী ধাপ হবে ছোট আকারের ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল। তার মতে, চূড়ান্ত পর্যায়ের ফুসফুস রোগীদের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি একমাত্র ভরসা হতে পারে, কারণ এরা প্রায়শই অঙ্গের জন্য অপেক্ষার তালিকায় থাকা অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করে।

গবেষক মোহিউদ্দিনের মতে, অঙ্গ দাতার শরীর থেকে অঙ্গ সরানোর পর বিশেষ সংরক্ষণ দ্রবণ ফুসফুসের রক্তনালীগুলোতে প্রবাহিত করলে ক্ষতির ঝুঁকি অনেকটাই কমানো সম্ভব। গবেষক দলও স্বীকার করেছে, ভবিষ্যতে অঙ্গ সংরক্ষণ প্রক্রিয়া উন্নত করা এবং আরও জেনেটিক পরিবর্তন (যেমন প্রতিরক্ষামূলক জিন যুক্ত করা) অঙ্গকে রক্ত জমাট বাঁধা ও রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত রাখতে সহায়ক হতে পারে।

লেখক: সাফিয়া তাবাসসুম রুমু
রেফারেন্স: DOI: 10.1038/s41591-025-03861-x

বিবর্তন

মানুষের দুই পায়ে হাঁটার রহস্য উদঘাটন

নতুন একটি গবেষণায় প্রথমবারের মতো মানুষের পেলভিসের ভ্রূণীয় বিকাশে দুটি বিশেষ ধাপ চিহ্নিত হয়েছে, যা অন্য প্রাইমেটদের থেকে আলাদা। এই ধাপগুলিই মানুষকে সোজা হয়ে দুই পায়ে হাঁটার উপযোগী করে তোলে। পাশাপাশি, কিছু বিশেষ জিনেরও ভূমিকা পাওয়া গেছে, যা পেলভিসের আকৃতি গঠনে অপরিহার্য। অর্থাৎ, আমাদের হাঁটা ও দেহগঠনের পেছনে রয়েছে জটিল জেনেটিক ও বিবর্তনীয় প্রক্রিয়ার সমন্বয়।

Nick Veasey/Science Photo Library/Alamy

সব মেরুদণ্ডী প্রাণীরই একটি পেলভিস (কোমরের হাড়) থাকে, কিন্তু এর মধ্যে কেবল মানুষই এটি ব্যবহার করে সোজা হয়ে দুই পায়ে হাঁটার জন্য। প্রায় ৫০ লক্ষ বছর আগে মানুষের পেলভিস ও দুই পায়ে হাঁটার ভঙ্গির (gait) বিবর্তন শুরু হলেও এর সঠিক বিবর্তন প্রক্রিয়া এতদিন রহস্যই ছিল।

সম্প্রতি গবেষকরা পেলভিসে যে গুরুত্বপূর্ণ কাঠামোগত পরিবর্তন হয়েছিল, তার ম্যাপ তৈরি করেছেন যা প্রাচীন মানুষকে প্রথমবার দুই পায়ে হাঁটার সুযোগ দেয় এবং একই সঙ্গে বড় মস্তিষ্কবিশিষ্ট শিশুর জন্ম দেওয়ার মতো শারীরিক ক্ষমতাও তৈরি করে। ২৭ আগস্ট, ২০২৫ *Nature* জার্নালে প্রকাশিত এক গবেষণায় বিজ্ঞানীরা মানুষের ও অন্যান্য স্তন্যপায়ীর ভ্রূণ অবস্থায় পেলভিসের গঠন প্রক্রিয়ার তুলনা করেছেন। এতে দেখা গেছে, ভ্রূণ অবস্থায় পেলভিসের তরুণাস্থি (cartilage) ও হাড়ের বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত দুটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ মানুষকে অন্যান্য এইপদের থেকে আলাদা বিবর্তনপথে নিয়ে যায়।

জার্মানির লাইপজিগে ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ইন্সটিটিউট ফর ইভোলিউশনারি অ্যানথ্রোপলজির প্যালিওঅ্যানথ্রোপলজিস্ট ট্রেসি কিভেল বলেন, "আমাদের করোটির নিচ থেকে শুরু করে পায়ের আঙুল পর্যন্ত সবকিছুই বদলে গেছে মানুষকে দুই পায়ে হাঁটার উপযোগী করার জন্য।"

তিনি আরও বলেন, এই গবেষণা শুধু আধুনিক মানুষের ক্ষেত্রেই নয়, প্রাচীন হোমিনিন যেমন ডেনিসোভানদের জীবাশ্ম নিয়েও নতুন উপলব্ধি তৈরি করছে।

মানুষের পেলভিস সময়ের সাথে একটি প্রশস্ত, বাটি-আকৃতির গঠন নেয়, যা সোজা হয়ে হাঁটার জন্য অপরিহার্য। কিন্তু এই গঠন কীভাবে এল, তা এতদিন অজানা ছিল। গবেষণার গবেষক ও হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির ডেভেলপমেন্টাল জেনেটিসিস্ট টেরেন্স ক্যাপেলিনি বলেন, "মানুষের পেলভিস চিম্পাঞ্জি বা গরিলার পেলভিস থেকে নাটকীয়ভাবে ভিন্ন। আমরা জানতে চেয়েছিলাম আসলে এখানে কী ঘটছে।"

তদন্তে গবেষকেরা মানুষের পেলভিসের ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ের নমুনা নিয়ে শারীরস্থানগত (anatomical), টিস্যু-ভিত্তিক (histological) এবং জিনোমিক পরিবর্তন বিশ্লেষণ করেন। এরপর তা তুলনা করা হয় ইঁদুর, গিবন ও চিম্পাঞ্জির ভ্রূণের সঙ্গে।

গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু ছিল ইলিয়াম (ilium) নামের একটি পেলভিস হাড় যা অভ্যন্তরীণ অঙ্গসমূহকে সহায়তা করে এবং গ্লুটিয়াল পেশিকে ভর দেয় হাঁটা স্থিতিশীল করতে। গবেষকরা মিউজিয়ামে সংরক্ষিত বিভিন্ন প্রাইমেট ভ্রূণ ব্যবহার করেন, যেগুলোর অনেকগুলো ১০০–২০০ বছর ধরে সংরক্ষিত ছিল।

ইলিয়াম নামক একটি হাড়ের জটিল জেনেটিক এবং আণবিক পরিবর্তনগুলি মানুষের পেলভিসকে এমনভাবে গঠন করতে সাহায্য করেছে যা আমাদের দুই পায়ে হাঁটতে সাহায্য করে (Massimo Brega/Science Photo Library)

বিশ্লেষণে মানুষের ইলিয়ামের বিকাশে দুটি বিশেষ ধাপ চিহ্নিত করা হয়—

প্রথম ধাপ: গর্ভধারণের প্রায় ৭ সপ্তাহ পর ইলিয়ামের তরুণাস্থি একটি উল্লম্ব দণ্ডের মতো তৈরি হয়। অন্য প্রাইমেটদের ক্ষেত্রেও একইভাবে শুরু হয়। কিন্তু পার্থক্য ঘটে এরপর। মানুষের ভ্রূণে তরুণাস্থিটি দ্রুত ৯০ ডিগ্রি ঘুরে যায়। এর ফলে পেলভিস ছোট ও প্রশস্ত হয়।

দ্বিতীয় ধাপ: গর্ভধারণের প্রায় ২৪ সপ্তাহ পর তরুণাস্থি হাড়ে রূপ নিতে শুরু করে (ossification)। তবে মানুষের ক্ষেত্রে কিছু হাড়কোষ অন্য প্রাইমেটদের তুলনায় অনেক পরে তৈরি হয়। এতে তরুণাস্থি দীর্ঘ সময় তার আকার ধরে রাখতে পারে এবং পেলভিস সঠিক আকৃতিতে বৃদ্ধি পায়।

এই দুটি ধাপ মিলিয়ে মানুষের পেলভিস এমন আকৃতি পায়, যা দুই পায়ে হাঁটার জন্য নিখুঁত।

মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর পেলভিস গঠনের ভিন্নতা চিহ্নিত করার পাশাপাশি গবেষকেরা কয়েকটি জিন শনাক্ত করেছেন, যেগুলো ইলিয়ামে তরুণাস্থি বৃদ্ধি ও হাড়ের গঠন নিয়ন্ত্রণ করে। মোট পাঁচটি জিন পেলভিসের আকৃতি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে বলে তারা জানান।

ডিউক ইউনিভার্সিটির বায়োলজিক্যাল অ্যানথ্রোপলজিস্ট ড্যানিয়েল শ্মিট বলেন, "তারা যে পরিমাণ কাজ করেছে, তা সত্যিই বিস্ময়কর। এর মাধ্যমে আমরা এমন এক প্রক্রিয়া জানতে পারলাম, যা হাড়ের আকৃতি পরিবর্তন করতে সক্ষম, অথচ আগে একেবারেই জানা ছিল না।"

কিভেল আরও বলেন, এই গবেষণা তাকে ভাবাচ্ছে প্রাচীন হোমিনিন জীবাশ্ম থেকে পাওয়া ডিএনএ কি আমাদের জানাতে পারবে, কোন জিন মানুষের কঙ্কালের বিকাশে কীভাবে প্রভাব ফেলেছিল।

লেখক: জান্নাতুল মাইশা
রেফারেন্স: *DOI: 10.1038/s41586-025-09399-9*

জীবন

লক্ষ বছর ধরে পারমাফ্রস্টে জীবিত থাকার জীবাণুর রহস্য

গবেষকেরা সাইবেরিয়ার প্রাচীন বরফ থেকে জীবাণু আবিষ্কার করেছেন, যারা অন্তত ১ লক্ষ বছর ধরে জীবিত থেকেছে বলে জানা গেছে। এরা অ্যাজগার্ড আর্কিয়া গোষ্ঠীর সদস্য, যাদেরকে জটিল কোষবিশিষ্ট জীবের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ আত্মীয় মনে করা হয়। এ আবিষ্কার আমাদের জীবের দীর্ঘায়ু ও বিবর্তন সম্পর্কে নতুন ধারণা দিচ্ছে।

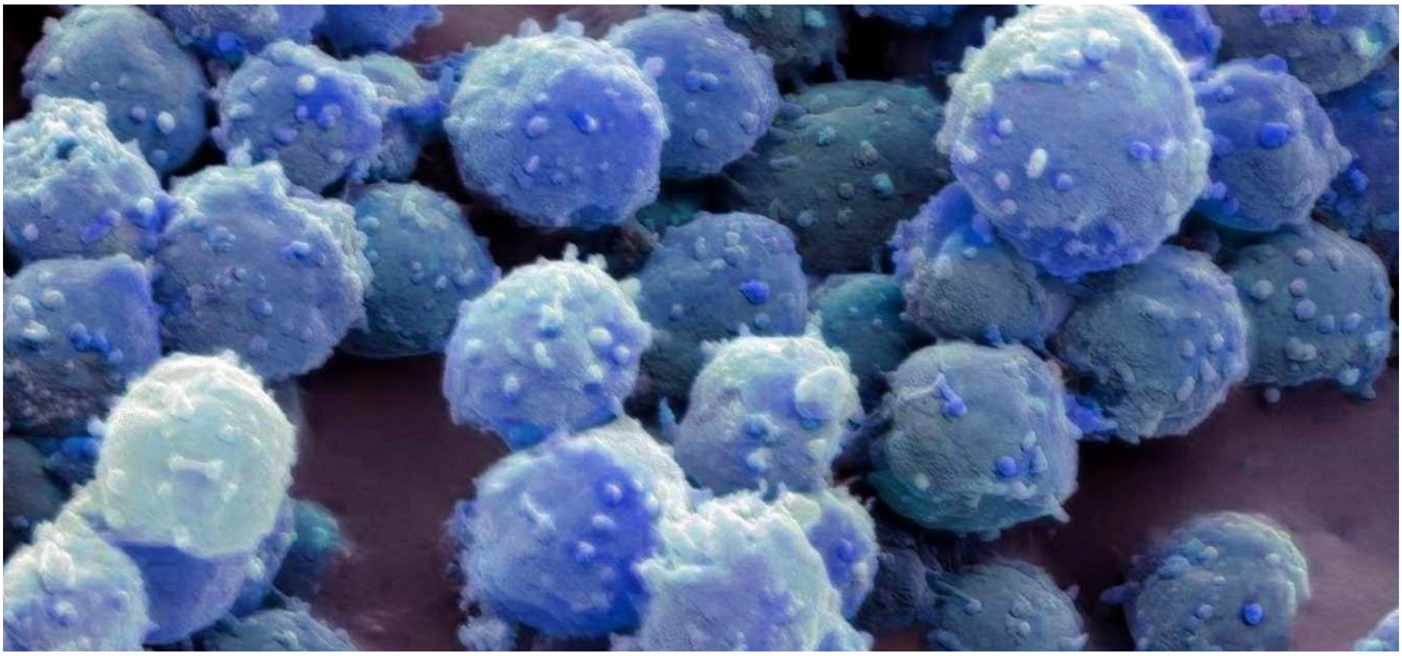

Steve Gschmeissner/Science Photo Library

সাইবেরিয়ার পারমাফ্রস্ট থেকে আলাদা করা কিছু অণুজীব (মাইক্রোব) সম্ভবত এক লক্ষ বছরেরও বেশি সময় ধরে জীবিত ছিল, এমনটাই জানা গেছে তাদের ডিএনএ বিশ্লেষণে। তাদের জিনগত মিল অন্য প্রজাতির সঙ্গে এ ইঙ্গিত দেয় যে এত দীর্ঘকাল টিকে থাকার ক্ষমতা জটিল কোষবিশিষ্ট জীবের নিকটাত্মীয় অনেক অণুজীবের মধ্যেই থাকতে পারে।

এর আগে গবেষকেরা প্রাচীন সামুদ্রিক তলানি থেকেও অণুজীব আলাদা করেছিলেন যার বয়স ১০ কোটি বছরেরও বেশি। তবে এত দীর্ঘ সময় ধরে একই জীব আসলে জীবিত থাকতে পারে কিনা, তা এখনো অনিশ্চিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যারেন লয়েড বলেন, "আমি তো এত দীর্ঘ সময় ধরে কোনো পরীক্ষা চালাতে পারি না। সময় আসলে গবেষণার সবচেয়ে অদ্ভুত ভেরিয়েবল।"

লয়েড ও তাঁর দল এমন জায়গায় অণুজীব খুঁজতে চেয়েছিলেন, যেখানে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। তাঁদের ধারণা ছিল, সেখানে যদি কিছু জীবিত থাকে, তবে সেটি নিশ্চয়ই সেই পরিবেশের সমবয়সী। এ উদ্দেশ্যে তাঁরা সাইবেরিয়ার পূর্বতম প্রান্ত চাকচি উপদ্বীপে গিয়ে ২২ মিটার লম্বা বরফকূপ খনন করেন।

এভাবে তাঁরা এমন এক স্তরের সামুদ্রিক তলানি থেকে ডিএনএ সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন, যা প্রায় ১ লক্ষ থেকে ১ লক্ষ ২০ হাজার বছর আগে জমে গিয়েছিল। এই তলানিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরল পানির ফাঁক ছিল, যেখানে জীবাণুগুলো আটকা পড়ে থাকতে পারে, আর বাইরে থেকে কোনো পুষ্টি বা জীব ঢোকা–বের হওয়ার সুযোগ ছিল না। লয়েড বলেন, "বরফে জমাট বাঁধার মানে হলো তাদের চারপাশে বরফের গঠন তৈরি হয়।"

এরপরের প্রশ্ন ছিল, কোনগুলো জীবিত আর কোনগুলো মৃত কোষ? গবেষকেরা এজন্য পারমাফ্রস্ট থেকে মিলিয়ন মিলিয়ন ডিএনএ টুকরো সিকোয়েন্স করেন এবং সেগুলো থেকে ভিন্ন ভিন্ন জীবাণুর জিনোম পুনর্গঠন করেন। এরপর তাঁরা একটি এনজাইম যোগ করেন, যা ক্ষতিগ্রস্ত ডিএনএ মেরামত করে, এবং আবারও জিনোম পুনর্গঠন প্রক্রিয়া চালান।

দেখা যায়, ডিএনএ মেরামতকারী এনজাইম যোগ করার পর বেশিরভাগ জিনোম অনেক বেশি পূর্ণাঙ্গভাবে পুনর্গঠিত হয়েছে যা ইঙ্গিত দেয় এগুলো মৃত কোষ থেকে এসেছে, কারণ তারা নিজের ডিএনএ অক্ষত রাখতে পারেনি। কিন্তু ছয়টি প্রজাতির জিনোমে প্রায় কোনো পরিবর্তন হয়নি। এর মানে তাদের ডিএনএ জীবিত কোষ থেকেই এসেছে, যেগুলো বরফে আটকা পড়ার পর অন্তত ১ লক্ষ বছর ধরে সক্রিয়ভাবে নিজেদের জিনোম টিকিয়ে রেখেছে।

এই ছয়টি প্রজাতিই এসেছে প্রোমিথিআর্কিওটা (Promethearchaeota) পর্ব (phylum) থেকে, যাদেরকে অ্যাজগার্ড আর্কিয়া (Asgard archaea) নামেও ডাকা হয়। এই অণুজীবগুলোকেই ধরা হয় ইউক্যারিওটদের (যার মধ্যে প্রাণী, উদ্ভিদ, ছত্রাক ও প্রোটিস্টরা অন্তর্ভুক্ত) সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ জীবিত আত্মীয়।

চায়না ইউনিভার্সিটি অব জিওসায়েন্সেস-এর রেনসিং লিয়াং বলেন, "প্রাচীন পারমাফ্রস্টে জীবিত অ্যাজগার্ড আর্কিয়া আবিষ্কার মানে আমরা তাদের বিবর্তনীয় ইতিহাসে এক নতুন জানালা খুলতে পারলাম… এবং জটিল জীবের উদ্ভবের সময় তারা কীভাবে ভূমিকা রেখেছিল, তা বোঝার চেষ্টা করতে পারব।"

"গবেষকেরা পারমাফ্রস্ট থেকে মিলিয়ন মিলিয়ন ডিএনএ টুকরো সিকোয়েন্স করেন"

অবাক করার মতো ব্যাপার হলো, এত দীর্ঘকাল টিকে থাকা অ্যাজগার্ড আর্কিয়া আর তুলনামূলক খোলা পরিবেশে পাওয়া অ্যাজগার্ড আর্কিয়ার মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। সবার মধ্যেই প্রোটিন ও ডিএনএ মেরামতের মতো একই ধরনের জিন রয়েছে, যা তাদের কোষ বিভাজন ছাড়াই খুব ধীরে ধীরে অংশ বদলাতে সাহায্য করেছে। লয়েড রসিকতা করে বলেন, "এরা যেন পৃথিবীর সবচেয়ে নিরস অ্যাজগার্ড। আর এই নিরসতাই প্রমাণ করে যে আসলে তাদের সবার মধ্যেই এ ক্ষমতা রয়েছে।"

রোড আইল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টিফেন ড'হন্ডট বলেন, এই গবেষণা আসলেই "একটি বড় অগ্রগতি"—যা থেকে আমরা অস্বাভাবিক দীর্ঘ জীবনকাল বোঝার দিকে এগোচ্ছি, এবং জানতে পারছি এর বিস্তৃতি ও বিবর্তনীয় ভিত্তি সম্পর্কে।

তবে তিনি সতর্ক করে বলেন, এই ফলাফল পারমাফ্রস্টের মতো জমাট পরিবেশের বাইরের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা উচিত নয়। তাঁর ভাষায়, "বরফে জমাট থেকে বহুদিন নিষ্ক্রিয় থাকা আর দীর্ঘদিন খুব কম সক্রিয় থেকে বেঁচে থাকার মধ্যে বড় পার্থক্য আছে।"

লেখক: ফাইজাহ্ সুলতানা

রেফারেন্স: DOI: [10.1101/2025.03.11.642519]

সংবাদ

মনোবিজ্ঞান

নার্সিসিস্টদের নিয়ে কিছু সত্য কথা

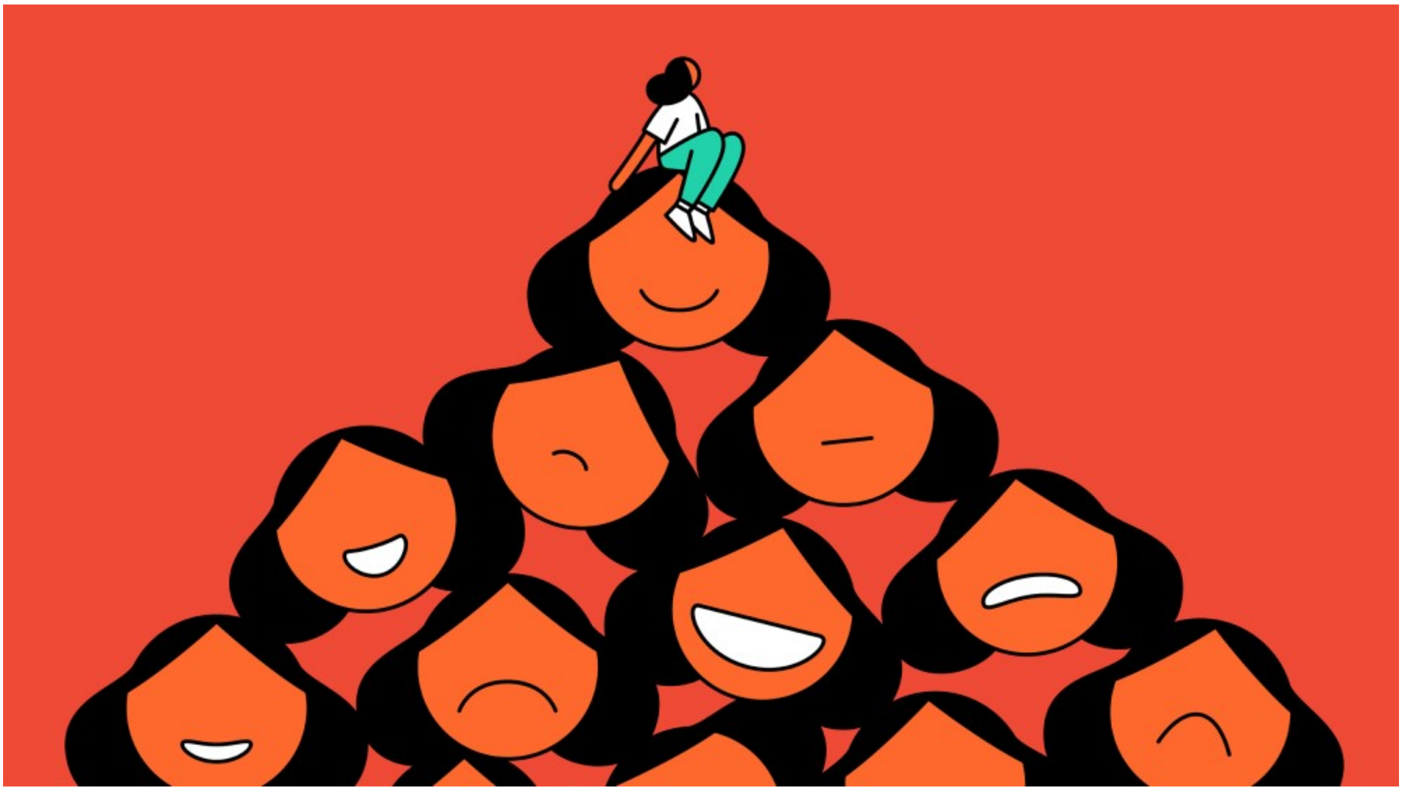

Rose Wong/NBC News

একটু আত্মমুগ্ধ বা নার্সিসিস্টদের নিয়ে কথা বলি। আমার এক দূরবর্তী আত্মীয় ছিলো। সে সবসময় সবার চেয়ে সব বিষয়ে বেশি জানার দাবি করত। কখনও নিজেকে বিশ্বমানের শিক্ষক, ডাক্তার, লেখক বা ক্রীড়াবিদ হওয়ার যোগ্য বলে প্রচার করত, আবার একই সঙ্গে নিজের বিনয়ের কথাও গর্ব করে বলত। কেউ দ্বিমত পোষণ করলেই শুরু হয়ে যেত চিৎকার-চেঁচামেচি কিংবা হঠাৎ রাগের বিস্ফোরণ।

তার দিকে তাকালে লক্ষণগুলো ছিল একেবারেই স্পষ্ট: নিয়ন্ত্রণের প্রতি অস্বাভাবিক আসক্তি, অতিরঞ্জনের রোগগ্রস্ত প্রবণতা আর এক ধরনের হাস্যকর শ্রেষ্ঠত্ববোধ।

পরিবারের বন্ধুদের বিশ্বাসই হতো না যখন আমি এসব বলতাম। তাদের একজন বলেছিল, "আমাদের সঙ্গে দেখা হলে তো ও ভদ্রতার প্রতিমূর্তি হয়ে ওঠে।" এগুলো ছিল Narcissistic Personality Disorder (NPD)-র ক্লাসিক বৈশিষ্ট্য। এই মানসিক সমস্যার বৈশিষ্ট্য হলো অন্যের অনুভূতির প্রতি অগ্রাহ্য মনোভাব আর চরম আত্মমর্যাদাবোধ, যা প্রায়ই সম্পর্কের ক্ষেত্রে মানসিক নির্যাতন হিসেবে প্রকাশ পায়। তবে তখন আমি আমার সেই আত্মীয়ের এই আচরণের কোন অর্থ খুঁজে পাচ্ছিলাম না কারণ তখনও ১০ বছর বয়সী আমার কাছে "নার্সিসিজম" নিয়ে এতটা তথ্যের সহজলভ্যতা ছিলো না।

এছাড়াও ২০১২-১৩ এর দিকে নার্সিসিজম নিয়ে এত আলোচনাও হতো না। আমি যখন "narcissist" শব্দটা শিখি তখন একবার গুগলে 'narcissistic abuse' লিখে সার্চ করেছিলাম। মাত্র ৮-১০ টা ফলাফল এসেছিল। Raised by Narcissists ও How to Leave a Narcissist... For Good বইয়ের লেখক সারা ডেভিস নিজেও এমন কথা বলেছেন।

এখন NPD নিয়ে ব্যাপক আগ্রহ এর সচেতনতা বাড়িয়েছে এবং যারা আত্মমুগ্ধদের দ্বারা নির্যাতিত হয়েছেন তাদের জন্য নতুন এক ভাষা দিয়েছে বিষয়টি আলোচনা করার। তবে একই সঙ্গে অনেক ভ্রান্ত তথ্যও ছড়িয়ে পড়েছে, যা এই সমস্যায় ভোগা মানুষদের এবং তাদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্তদের প্রয়োজনীয় সহায়তা পাওয়া থেকে বিরত রাখতে পারে। তাহলে NPD আসলে কী? আর এটি কি চিকিৎসা করা যায়?

নিজের প্রেমে পড়া

মানবজাতির আত্ম-আরাধনার প্রতি আগ্রহ বহু পুরোনো। রোমান কবি ওভিড যখন পৌরাণিক চরিত্র নার্সিসাসকে জনপ্রিয় করেন, তখনই এর ইঙ্গিত মেলে। দেবতাদের অভিশাপে নার্সিসাস নিজের প্রতিবিম্বের প্রেমে পড়েছিল। উনিশ শতকের শেষ দিকে "নার্সিসিস্টিক" শব্দটি প্রথমে অতিরিক্ত হস্তমৈথুনের ক্ষেত্রে ব্যবহার হতো। ১৯২০-এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে এটি সাধারণ ব্যক্তিত্বগত ব্যাধিকে বোঝাতে শুরু করে। আর এর ৫০ বছর পর মানসিক ব্যাধির নির্ণায়ক গ্রন্থ DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders)-এ NPD অন্তর্ভুক্ত হয়।

নার্সিসিজমকে "ডার্ক ট্রায়াড"-এর একটি দিক হিসেবে ধরা হয়। ডার্ক ট্রায়াড হলো তিনটি ব্যক্তিত্ব বৈশিষ্ট্যের সমষ্টি, যা নির্মম এবং নিষ্ঠুর আচরণে প্ররোচিত করতে পারে।

DSM-এর সংজ্ঞা অনুযায়ী, NPD-এর বৈশিষ্ট্য হলো গৌরববোধ, অস্বাভাবিকভাবে প্রশংসা পাওয়ার তৃষ্ণা এবং অন্যদের প্রতি সহানুভূতির অভাব। এই ধরনের মানুষ প্রায়ই নিজেদের ক্ষমতা অতিরঞ্জিত করে আর অর্জনগুলো ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বলে। তাদের স্ফীত অহংকার আসে বিশেষ অধিকারবোধ, প্রশংসা ও স্থায়ী মনোযোগের প্রয়োজন এবং এক ধরনের বিচ্ছিন্নতার অনুভূতি নিয়ে। তাদের চোখে সাধারণ মানুষ কখনোই এত অসাধারণ হওয়ার সমস্যাগুলো বুঝতে পারবে না। নার্সিসিস্টরা প্রায়ই হিংসায় ভোগে। এরা অন্যদের প্রতি প্রবল হিংসা পোষণ করে কিংবা ভাবে অন্যরা তাদের প্রতি হিংসান্বিত। আর সম্ভবত সবচেয়ে ক্ষতিকর দিক হলো তারা অনেক সময় অন্যকে শোষণ ও নিয়ন্ত্রণ করে, অন্যের ক্ষতির বিষয়ে খুব একটা গুরুত্ব না দিয়ে। এর ফলাফল হতে পারে মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন।

"সব নার্সিসিস্টই যে নির্যাতনমূলক আচরণ করে তা নয়," বলেন ডেভিস। তবে তিনি আরও বলেন, আত্মমুগ্ধদের দ্বারা নির্যাতন চিনে ওঠা কঠিন হতে পারে কারণ তারা কৌশলে প্রতারণা ও "গ্যাসলাইটিং"-এ পারদর্শী হয়। বাকি দুটি দিক হলো সাইকোপ্যাথি (যার বৈশিষ্ট্য হলো হঠকারী প্রবণতা ও সহানুভূতির অভাব) এবং ম্যাকিয়াভেলিয়ানিজম (যার বৈশিষ্ট্য হলো কৌশলী এবং অনেক সময় নীতিহীন মনোভাব)।

মনোবিজ্ঞানীরা সাধারণ মানুষের মধ্যে আত্মমুগ্ধতার বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করতে Narcissistic Personality Inventory (NPI) নামের একটি স্ব-প্রতিবেদিত প্রশ্নপত্র ব্যবহার করেন। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে NPD নির্ণয়ের জন্য একজন চিকিৎসকের সঙ্গে গভীর সাক্ষাৎকারের প্রয়োজন হয়। কিন্তু যাদের মধ্যে এই সমস্যার বৈশিষ্ট্য থাকে, তারা প্রায়ই মনে করে যে তাদের চিকিৎসার প্রয়োজনই নেই। "একজন প্রকৃত নার্সিসিস্ট সব সমস্যার দায় অন্য কারও উপর চাপিয়ে দেবে," বলেন ডেভিস।

ফলে মোট কত মানুষ NPD-তে ভুগছেন তা অনুমান করা কঠিন হয়ে পড়ে। বিভিন্ন গবেষণার ফলও ভিন্ন। সবচেয়ে বড় জরিপ হলো National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions। ২০০১-২০০২ সালে এই গবেষণায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৩৪,৬৫৩ জন বাসিন্দার সঙ্গে মুখোমুখি সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। এর মধ্যে ২১৪৮ জনের NPD শনাক্ত করা হয়, যা আনুমানিক ৬.২ শতাংশ প্রাদুর্ভাব নির্দেশ করে। তবে ছোট আকারের অন্য গবেষণাগুলো সাধারণত কম হার দেখিয়েছে, যার গড় প্রায় ১ শতাংশ।

তবে সঠিক সংখ্যা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও বেশিরভাগ মনোবিজ্ঞানী একমত যে NPD আসলে আচরণগত স্পেকট্রামের একদম শেষ প্রান্তে, যার কিছুটা বৈশিষ্ট্য সবার মধ্যেই থাকে। "কিছুটা মাত্রায় এবং নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে এই বৈশিষ্ট্যগুলো আসলে সহায়কও হতে পারে," বলেন ফিনল্যান্ডের হেলসিঙ্কি বিশ্ববিদ্যালয়ের এমি কোস্কিনেন। পরিমিত আত্মবিশ্বাস আমাদের বড় কিছু অর্জনের অনুপ্রেরণা দিতে পারে, আর নিজের চাহিদা ও প্রয়োজন নিয়ে দৃঢ় থাকা ভুল নয়। "কিন্তু যখন [এই বৈশিষ্ট্যগুলো] অতিরিক্ত হয়ে ওঠে, তখন এগুলো সম্পর্কের জটিলতা ও ব্যক্তির পাশাপাশি আশেপাশের মানুষের জন্য নেতিবাচক পরিণতির দিকে নিয়ে যায়," বলেন কোস্কিনেন।

আত্মমুগ্ধতা প্রক্রিয়াকরণ

নার্সিসিজম চিহ্নিত করা মনোবিজ্ঞানীদের সাহায্য করতে পারে "আত্মমুগ্ধরা চারপাশের পৃথিবীকে কিভাবে প্রক্রিয়াজাত করে, আর হয়তো কিভাবে তারা বদলাতে পারে" তা বুঝতে।

DSM-এ NPD-এর সংজ্ঞায় সহানুভূতির অভাবকে মূল বৈশিষ্ট্য হিসেবে উল্লেখ করা হলেও গবেষকরা বলছেন, সহানুভূতি ও নার্সিসিজমের সম্পর্ক অনেক জটিল। উদাহরণস্বরূপ, ২০২৩ সালের একটি বিশ্লেষণে দেখা গেছে,

NPD আক্রান্তদের আবেগগত সহানুভূতি (অন্যের অনুভূতি নিজের ভেতর অনুভব করা) দুর্বল হলেও জ্ঞানগত সহানুভূতি (অন্যের কী অনুভূতি হচ্ছে তা বোঝা) নষ্ট হয় না। এর মানে হলো, আত্মমুগ্ধরা হয়তো অন্যের আবেগ বোঝে কিন্তু সেই জ্ঞান তারা নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে পারে, অথবা একেবারেই পরোয়া করে না।

অন্যদের আবেগ নিয়ে এই উদাসীনতা তাদের নিজের অনুভূতি নিয়ে অতি-আবিষ্ট হওয়ার সম্পূর্ণ বিপরীত। আত্মমুগ্ধরা সাধারণত খুব সহজেই অপমানিত বোধ করে। যেমন ২০১৫ সালে উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিস্টোফার ক্যাসিও ও তাঁর সহকর্মীরা এক গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের দিয়ে একটি কম্পিউটার গেম খেলান, যেখানে তিনজন খেলোয়াড় বল একে অপরকে পাস করে। তবে আসলে অন্য দু'জন খেলোয়াড়কে নিয়ন্ত্রণ করছিল কম্পিউটার আর তারা ধীরে ধীরে বাস্তব অংশগ্রহণকারীকে উপেক্ষা করতে শুরু করে অর্থাৎ নিজেরাই নিজেদের মধ্যে বল পাস করা শুরু করে। অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রে এই সামাজিক বর্জনের অভিজ্ঞতা মস্তিষ্কের যেসব অংশ কষ্ট প্রক্রিয়াজাত করে (যেমন anterior insula) সেখানে কার্যকলাপ বাড়িয়ে দেয়। আর এই কার্যকলাপের মাত্রা অংশগ্রহণকারীদের NPI স্কোরের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। যত বেশি আত্মমুগ্ধ বৈশিষ্ট্য, তত বেশি মানসিক কষ্ট।

এই ফলাফল থেকে গবেষকরা অনুমান করছেন, নার্সিসিজম আসলে সামাজিক মূল্যায়ন নিয়ে অতিরিক্ত উদ্বেগ থেকে তৈরি হতে পারে, যেখানে আত্মপ্রচারমূলক আচরণটা নিজের ইগো রক্ষার এক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা।

এই ধারণা পরীক্ষা করতে কোস্কিনেন ও তাঁর সহকর্মীরা অংশগ্রহণকারীদের প্রথমে NPI পূরণ করতে বলেন, তারপর তাদের জোড়ায় ভাগ করে জীবনের সুখ-দুঃখ নিয়ে কথা বলতে বলেন, যেমন কখন তারা প্রশংসিত বা লজ্জিত বোধ করেছেন। এদিকে আঙুলে সংযুক্ত ইলেক্ট্রোডে ঘামের মাত্রা মাপা হচ্ছিল, যা মানসিক চাপের ইঙ্গিত দেয়। দেখা গেল, যার NPI স্কোর যত বেশি, ঘনিষ্ঠ আলাপচারিতার সময় তিনি তত বেশি ঘামছিলেন। অন্যকে প্রভাবিত করার তীব্র ইচ্ছা তাদেরকে প্রবল মানসিক চাপে ফেলছিল।

এ বছর অর্থাৎ ২০২৫ সালের শুরুতে প্রকাশিত একাধিক গবেষণাতেও দেখা গেছে, আত্মমুগ্ধরা সামাজিক বর্জনকে কিভাবে উপলব্ধি করে। উদাহরণস্বরূপ, সুইজারল্যান্ডের বাসেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিস্টিয়ানে বিউটনার অনলাইন অংশগ্রহণকারীদের একাধিক কল্পিত পরিস্থিতি নিয়ে ভাবতে বলেন, যেগুলো সামাজিক বর্জনের অনুভূতি বোঝায়। যারা প্রশ্নপত্রে বেশি নার্সিসিজম স্কোর করেছিল, তারা কম স্কোরধারীদের তুলনায় পরিস্থিতিগুলোকে ইচ্ছাকৃত বর্জন হিসেবে দেখার সম্ভাবনা উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি ছিল।

"তাদের মর্যাদা বা স্বীকৃতির যেকোনো হুমকি ভীষণ অস্বস্তিকর," বলেন বিউটনার। এই পক্ষপাত স্পষ্ট হয় মানুষের জীবনযাপনের প্রতিফলনে, যখন দুই সপ্তাহ ধরে প্রতিদিন সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার হিসাব রাখতে বলা হয়েছিল। বেশি নার্সিসিস্ট অংশগ্রহণকারীরা তাদের দৈনন্দিন জীবনে বেশি সামাজিক বর্জনের অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছিল, যখন গত ১৪ দিনে কতবার তারা বর্জিত হয়েছিল তা মনে করতে বলা হলো, তারা আসল রেকর্ডের তুলনায় ঘটনাগুলো অতিরঞ্জিত করে জানাল। এর মানে তাদের স্মৃতি বর্জনের অনুভূতির দিকে পক্ষপাতদুষ্ট।

আপনি ভাবতে পারেন, বারবার বর্জিত হওয়ার অভিজ্ঞতা হয়তো তাদের ভ্রান্ত শ্রেষ্ঠত্ববোধ কমিয়ে আনবে। কিন্তু আরেকটি দীর্ঘমেয়াদি গবেষণায় দেখা গেছে, আসলে এর বিপরীতটাই ঘটে। ১৪ বছরের তথ্য বিশ্লেষণ করে বিউটনার দেখেছেন, সামাজিক বর্জনের অনুভূতি থাকলে পরবর্তী ১২ মাসে মানুষের নার্সিসিস্টিক বৈশিষ্ট্য আরও বেড়ে যেতে পারে। তাঁর ধারণা, বর্জিত হওয়ার বেদনা থেকে বাঁচতে এই অনুভূতি আত্মরক্ষামূলক আচরণ তৈরি করে।

সমস্যা হলো, যারা শুরু থেকেই আত্মমুগ্ধ বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে, তাদেরই আবার বেশি বর্জনের শিকার হতে হয় তাদের সমাজবিরোধী আচরণের কারণে। ফলে এক ধরনের স্ব-চালিত চক্র তৈরি হয়। "যদি বারবার বা দীর্ঘমেয়াদি বর্জন ঘটে, মানুষ হয়তো ক্ষতিপূরণ করতে শুরু করে। সেক্ষেত্রে নিজের আত্ম-ভাবমূর্তি ফুলিয়ে তোলে, নিজের প্রতি বেশি মনোযোগী হয়, বা অতিরিক্ত মনোযোগ আকর্ষণ ও বিরোধপূর্ণ আচরণে জড়িয়ে পড়ে," বলেন বিউটনার।

আত্মমুগ্ধতায় লিঙ্গভেদ কমে আসছে

DSM আলাদা করে নার্সিসিজমের ধরন নির্ধারণ না করলেও অনেক মনোবিজ্ঞানী মনে করেন, এর অন্তত দুটি উপধরন আছে, প্রকাশভঙ্গির ভিন্নতার ওপর ভিত্তি করে। Grandiose বা overt নার্সিসিস্টরা বাইরে থেকে বেশি

আত্মবিশ্বাসী মনে হয় এবং প্রকাশ্যে দম্ভোক্তি বা বড়াই করে। অন্যদিকে vulnerable বা covert নার্সিসিস্টরা বেশি অন্তর্মুখী। তারা মনে করে নিজেকে বিশেষ কিছু, কিন্তু প্রকাশ্যে তা দেখায় না; বরং অন্যদের কাছ থেকে আশ্বাস খোঁজে।

"ভালনারেবল নার্সিসিস্টরা সাধারণত নরম স্বভাবের, লাজুক, ভঙ্গুর এবং তাদের আত্মসম্মানও কম বলে মনে হয় তাই প্রথমে তাদের খুব একটা আত্মমুগ্ধ মনে হয় না," বলেন লন্ডনের সিটি সেন্ট জর্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফরেনসিক মনোবিজ্ঞানী আভা গ্রিন। "কিন্তু তাদের ভালোভাবে জানলে বোঝা যায়, ভঙ্গুরতার মুখোশের নিচে লুকিয়ে আছে কিছু বৈশিষ্ট্য: বিশেষ সুবিধা পাওয়ার প্রত্যাশা, নিজের সম্পর্কে আত্মপ্রচারমূলক কল্পনা, আর অন্যকে শোষণের প্রবণতা।"

একইভাবে, গ্র্যান্ডিওস নার্সিসিস্টরা বাইরে থেকে বেশি আত্মবিশ্বাসী মনে হয়, বলেন গ্রিন। "কিন্তু তারা ক্রমাগত অন্যের মনোযোগের খোঁজ করে, যাতে নিজের আত্মসম্মান টিকিয়ে রাখতে পারে। তাই ভেতরে সবসময় এক ধরনের ভঙ্গুরতা লুকিয়ে থাকে।" তাঁর মতে, ভেতরে ভেতরে তারা আসলে একই রকম। তিনি বলেন, "ভালনারেবল নার্সিসিস্টরা আগে হয়তো আমাদের চোখ এড়িয়ে গেছে, কিন্তু "তাদের দ্বারা অন্যদের যে ক্ষতি হতে পারে" সে ব্যাপারে আমাদের হেলাফেলা করা উচিত নয়।"

"গ্র্যান্ডিওস ও ভালনারেবল—দুই ধরনের নার্সিসিস্টের নির্যাতনের ধরন আলাদা নয়, কেবল পরিস্থিতি ভেদে তা প্রকাশ পায়," বলেন গ্রিন। তবে DSM মূল্যায়নে গ্র্যান্ডিওস নার্সিসিজমের আচরণকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়, ভালনারেবল নার্সিসিজমের তুলনায়। আর এটিই হতে পারে একটি বড় অন্ধকার জায়গা: কারণ গ্র্যান্ডিওস ধরনের প্রকাশ সাধারণত পুরুষদের মধ্যে বেশি দেখা যায়, আর মহিলারা বেশি প্রদর্শন করেন ভালনারেবল বৈশিষ্ট্য। এজন্যই হয়তো NPD-তে আক্রান্তদের প্রায় ৭৫ শতাংশই পুরুষ। কিন্তু উপধরন অনুযায়ী বিচার করলে দেখা যায়, নারীরা ভালনারেবল নার্সিসিজমে পুরুষদের তুলনায় বেশি স্কোর করেন।

"এর মানে এই নয় যে নার্সিসিজম কোনো লিঙ্গনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য," বলেন গ্রিন। "নারীরাও এই বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে, তবে এমনভাবে, যা গ্র্যান্ডিওস মূল্যায়নে ধরা পড়ে না।" তিনি বলেন, বিভিন্ন উপধরন আসলে পুরুষ ও নারীর সাংস্কৃতিক লিঙ্গভূমিকার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেমন একজন পুরুষ প্রকাশ্যে নিজের দক্ষতা নিয়ে দম্ভোক্তি করলে তা সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য মনে হতে পারে, কিন্তু একজন নারীর ক্ষেত্রে সমাজ বেশি প্রত্যাশা করে নম্র বা সংযত আচরণ।

সেলফির যুগে সামাজিক মাধ্যমের আত্মমুগ্ধরা

নার্সিসিজম নিয়ে সাম্প্রতিক আলোচনার বড় অংশই হচ্ছে অনলাইনে যা বেশ মানানসই, কারণ আজকাল এই বৈশিষ্ট্য সবচেয়ে স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে সামাজিক মাধ্যমে। বড় আকারের গবেষণায় দেখা গেছে, মানুষের নার্সিসিজম স্কোর অনুমান করতে পারে তারা কতবার অন্যদের সঙ্গে কনটেন্ট শেয়ার করবে, যদিও এটি কেবল গ্র্যান্ডিওস ধরনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ কি না তা এখনো পরিষ্কার নয়।

কিছু বিশেষজ্ঞ এমনকি দাবি করেছেন, সামাজিক মাধ্যম নার্সিসিজম বাড়িয়ে তুলছে তবে এর প্রমাণ এখনো দুর্বল। "আমি বলছি না যে এটা অসম্ভব, কিন্তু ভালো মানের তথ্য এখনো আমাদের কাছে নেই," বলেন যুক্তরাজ্যের এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যক্তিত্ববিষয়ক গবেষক রেনে মট্টুস।

সোশ্যাল মিডিয়া হয়তো NPD-এর প্রকোপ পরিবর্তন করছে না, কিন্তু এটি অবশ্যই সচেতনতা বাড়িয়েছে এবং দেখিয়েছে এই বৈশিষ্ট্য আমাদের সম্পর্কগুলোতে কতটা ক্ষতি ডেকে আনতে পারে। যেমন থেরাপিস্ট রামানি দুরবাসুলা জনপ্রিয় Navigating Narcissism পডকাস্ট চালান; ইনস্টাগ্রামে তাঁর ফলোয়ার সংখ্যা সাড়ে সাত লাখের বেশি। অন্যদিকে লি হ্যামক, একজন recovering narcissist, যিনি বহু বছরের থেরাপি নিয়েছেন নিজের আত্মকেন্দ্রিক প্রবণতা কাটিয়ে ওঠার জন্য, তাঁর ফলোয়ার সংখ্যা পাঁচ লাখের বেশি। এই লেখা প্রকাশের সময় পর্যন্ত ইনস্টাগ্রামে #narcissism ট্যাগে এক মিলিয়নেরও বেশি পোস্ট হয়েছে।

তবে অনলাইন আলোচনার মান অনেক সময় মিশ্রিত হয়। "সচেতনতা বৃদ্ধি ও আলোচনা খুব উপকারী, কিন্তু তথ্যগুলো সবসময় ক্লিনিক্যালভাবে নির্ভরযোগ্য নয়," বলেন ডেভিস। এখন 'নার্সিসিজম' শব্দটি প্রায় যেকোনো অপরিণত আবেগগত আচরণ বোঝাতে ব্যবহৃত হচ্ছে, যা মানুষের নিজেদের সমস্যাগুলো ভুলভাবে নির্ণয় করতে বাধ্য করছে।

"আমাদের এই ধরনের অতিরিক্ত জেনারেলাইজেশনের ব্যাপারে আরও সতর্ক হতে হবে।"

ডেভিস বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন যোগ্যতাহীন ইনফ্লুয়েন্সারদের নিয়ে, যারা পরামর্শ দিচ্ছেন। "সব রকম মানুষ তাদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করছে এবং আরও ভয়ের ব্যাপার হলো অনেকে আবার অন্যদের 'নার্সিসিস্টিক নির্যাতন' থেকে নিরাময়ের সেবা দিচ্ছে, অথচ তারা কখনো এর প্রশিক্ষণই নেয়নি," তিনি বলেন। "বড় আইরনি হলো, এ কাজটাই আসলে বেশ নার্সিসিস্টিক।"

যদি আপনি কখনো আত্মমুগ্ধদের নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকেন, ডেভিসের পরামর্শ হলো প্রামাণ্য সূত্রে ভরসা করা (যেমন যুক্তরাজ্যের দাতব্য সংস্থা See Through NPD) এবং প্রশিক্ষিত পেশাদারের সহায়তা নেওয়া। "থেরাপি সত্যিই সাহায্য করতে পারে, যাতে আপনি বোঝেন আসলে কী অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেছেন," তিনি বলেন। (বাংলাদেশে হলে Citizens' Initiative Against Domestic Violence (CIDV) এর সহায়তা নিতে পারেন।)

বদলানো কি সম্ভব?

আত্মমুগ্ধদের সাধারণত পরিবর্তন-অযোগ্য ও চিকিৎসা করা কঠিন হিসেবে দেখা হলেও কিছু কেস স্টাডি বলছে, তারা কাউন্সেলিং বা থেরাপিতে সাড়া দিতে পারে। যেমন ২০২৪ সালে হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের ইগর ওয়েইনবার্গের নেতৃত্বে এক গবেষণায় আটজন রোগীর তথ্য প্রকাশিত হয়। তারা Psychodynamic therapy (যেখানে শৈশবের অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করা হয়) কিংবা Dialectical Behavior Therapy – DBT (যেখানে জটিল আবেগ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করা হয়) নিয়েছিল। পাঁচ বছর পর্যন্ত চিকিৎসার পর দেখা গেল, তারা আর NPD-এর ক্লিনিক্যাল মানদণ্ডে পড়ে না, বরং অনেকের জীবন ইতিবাচকভাবে বদলেছে যেমন চাকরি পাওয়া বা বিয়ে করা।

অর্থাৎ, কিছু "চিতাবাঘ" তাদের দাগ বদলাতে পারে তবে এটি কতটা সাধারণভাবে ঘটে, তা এখনো দেখা বাকি। শেষ পর্যন্ত রোগীকে নিজের দোষ স্বীকার করতে হবে যা এমন কারও জন্য সহজ নয়, যে বিশ্বাসই করে না তার কোনো সমস্যা আছে। দশকের পর দশক পারিবারিক এক আত্মীয়ের সঙ্গে থেকে আমি নিজের অভিজ্ঞতায়ও দেখেছি যে একজন নার্সিসিস্টের সঙ্গে যুক্তি করা প্রায় অসম্ভব। তাদের চোখে তারা কখনো ভুল করে না, আর আমাদের জন্য সবচেয়ে ভালো হলো তাদের জীবন থেকে দূরে রাখা।

লেখক: তানভীর রানা রাব্বি

আপনার প্রতিক্রিয়া একান্ত কাম্য

info@bigganbarta.org

বিজ্ঞানবার্তা
bigganbarta.org